রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামি আয়োজিত আন্তর্জাতিক সিরাহ প্রতিযোগিতায়
১৭১টি পাণ্ডুলিপির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারী

নবিজির বিখ্যাত সিরাতগ্রন্থ

আর রাহিকুল মাখতুম

মূল

আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরি রাহিমাহুল্লাহ

তাহকিক

শাইখ আবু আবদির রহমান মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মাল্লাহ কৃত 'আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখুতম' গ্রন্থ অবলম্বনে

অনুবাদ

যায়েদ আলতাফ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

গ্রন্থ সম্পর্কে..... ২৩
ড. আব্দুল্লাহ উমর নাসিফের ভূমিকা.....২৬
শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল-হারাকান রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা ২৯
লেখকের কথা ৩৩
অনুবাদকের কথা..... ৩৫
সিরাত ও ইতিহাসগ্রন্থে দুর্বল বর্ণনা : গ্রহণ-বর্জনের নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনা
..... ৩৯

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও গোত্রসমূহ # ৪১

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ৪১
আরবের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী ৪৩
আল আরাবুল আরিবা..... ৪৩
আল-আরাবুল মুস্তারিবা ৪৬
আরবের শাসনব্যবস্থা ও নেতৃত্ব ৫৬
ইয়েমেনের তৎকালীন শাসনব্যবস্থা.....৫৭
হিরার শাসনব্যবস্থা ৬০
সিরিয়ার শাসনব্যবস্থা..... ৬৪
হিজাজের নেতৃত্ব..... ৬৪
কুসাই ইবনু কিলাবের আবির্ভাব..... ৬৮
সমগ্র আরবের শাসনব্যবস্থা..... ৭৩
আরবের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ৭৫
আরবের ধর্মীয় অবস্থা ৭৬
ইহুদি ধর্ম ৮৫
ইয়েমেনে ইহুদি ধর্মের প্রসার ৮৬
আরবে খ্রিষ্টধর্মের গোড়াপত্তন ৮৭
মাজুসি (অগ্নিপূজারি সম্প্রদায়) ৮৮
সাবেয়ি সম্প্রদায় ৮৮

নানা ধর্মের সমাহার: ইসলামের আগমনের পূর্বাবস্থা ৮৯
জাহিলি যুগের আরব সমাজ ৮৯
সামাজিক অবস্থা ৮৯
অর্থনৈতিক অবস্থা ৯৬
চারিত্রিক অবস্থা ৯৬

নবিজির বংশপরিচয়, জন্ম ও বেড়ে ওঠা # ১০০

নবিজির বংশ ১০০
নবিজির পরিবার..... ১০১
১. হাশিম..... ১০২
২. আব্দুল মুত্তালিব..... ১০৩
জমজম কূপ খনন ১০৫
হস্তীবাহিনীর ঘটনা ১০৫
নবিজির পিতা আবদুল্লাহ ১০৮
নবিজির জন্ম ও নবুওয়াতপূর্ব চল্লিশ বছর ১১১
বনু সাদে ১১৩
বক্ষ বিদারণ..... ১১৬
ফিরে এলেন মমতাময়ী মায়ের কোলে..... ১১৬
দাদার সান্নিধ্যে ১১৭
প্রিয় চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে..... ১১৮
তার উসিলায় বৃষ্টি কামনা ১১৮
পাদরি বাহিরা ১১৯
ফিজারের যুদ্ধ..... ১২০
হিলফুল ফুজুল..... ১২১
নবিজির কর্মমুখর পরিশ্রমী জীবন ১২৩
খাদিজার সঙ্গে শুভবিবাহ ১২৪
কাবার পুনর্নির্মাণ এবং বিরোধের মীমাংসা ১২৫
নবুওয়াতের আগে কেমন ছিলেন নবিজি ১২৭

নবুওয়াত, রিসালাত ও দাওয়াতি জীবন # ১৩০

মক্কি যুগ..... ১৩০
নবুওয়াত ও দাওয়াত..... ১৩০

হেরা গুহায় নবুওয়াত ও রিসালাতের ছায়াতলে..... ১৩১
ওহি নিয়ে জিবরাইল আলাইহিস সালামের আগমন ১৩২
ওহি বন্ধের সময়কাল ১৩৬
ওহিসহ পুনরায় জিবরাইল আলাইহিস সালামের আগমন ১৩৮

প্রথম পর্যায়: ইসলাম প্রচারের সংগ্রাম # ১৪৩

গোপনে দাওয়াত প্রদানের তিন বছর..... ১৪৩
ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম দল ১৪৩
সালাতের বিধান..... ১৪৫

দ্বিতীয় পর্যায়: প্রকাশ্যে দাওয়াত # ১৪৮

প্রকাশ্যে দাওয়াতের নির্দেশ..... ১৪৮
আপনজনদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত ১৪৯
সাফা পাহাড়ে ১৫০
নবিজি থেকে হাজিদের দূরে রাখার জন্য পরামর্শসভা ১৫৪
দাওয়াত প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশল ১৫৬
আল্লাহর রাসুলের ব্যাপারে মুশরিকদের অবস্থান ১৭৪
আবু তালিব সমীপে কুরাইশ প্রতিনিধিদল ১৭৪
কুরাইশ কর্তৃক আবু তালিবকে হুমকি ১৭৫
পুনরায় আবু তালিবের সমীপে কুরাইশরা..... ১৭৬
নবিজির ওপর বিভিন্নভাবে হামলা ১৭৮
দারুল আরকাম..... ১৮৫
হাবাশায় প্রথম হিজরত ১৮৬
মুসলিমদের সঙ্গে মুশরিকদেরও সিজদা করা এবং মুহাজিরদের ফিরে আসা.... ১৮৭
হাবাশায় দ্বিতীয় হিজরত ১৮৯
হাবাশায় হিজরতকারীদের বিরুদ্ধে কুরাইশের ষড়যন্ত্র..... ১৮৯
মুসলমানদের ওপর তীব্র নির্যাতন এবং নবিজিকে হত্যার প্রচেষ্টা ১৯৩
হামজা ইবনু আব্দিল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ ১৯৬
উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণের ঘটনা ১৯৮
উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলামগ্রহণ বিষয়ক বর্ণনাগুলোর সারসংক্ষেপ ১৯৯
আল্লাহর রাসুলের কাছে কুরাইশ প্রতিনিধি..... ২০৬
আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের আপসের চেষ্টা ২০৯

নবিজিকে হত্যার ব্যাপারে আবু জাহলের পরিকল্পনা..... ২১০
নবিজির সঙ্গে আপস ও ছাড় ২১২
কুরাইশদের হতভম্বতা, প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা এবং ইহুদিদের সঙ্গে তাদের পরামর্শ
..... ২১৪
বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের সঙ্গে আবু তালিবের বৈঠক..... ২১৬

সামগ্রিক বয়কট # ২১৭

জুলুম ও অত্যাচারের প্রতিজ্ঞা ২১৭
আবু তালিব গিরিপথে অবরুদ্ধ তিন বছর ২১৮
প্রতিজ্ঞাপত্র ছিঁড়ে ফেলা ২১৯
আবু তালিবের কাছে কুরাইশদের সর্বশেষ প্রতিনিধিদল ২২২

দুঃখ বেদনায় ভরা বছর # ২২৬

প্রিয় চাচা আবু তালিবের মৃত্যু ২২৬
খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার চিরবিদায়..... ২২৮
বিপদের পর বিপদ ২২৯
সাওদা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বিয়ে..... ২৩০
মুসলমানদের ধৈর্য ও অবিচলতার অন্তর্নিহিত কারণ..... ২৩০
এক. এক আল্লাহর প্রতি ইমান ২৩০
দুই. আকর্ষণীয় ও সম্মোহনী নেতৃত্ব ২৩১
তিন. দায়িত্ববোধের অনুভূতি..... ২৩৫
চার. আখিরাতের প্রতি ইমান ২৩৫
পাঁচ. কুরআনুল কারিম ২৩৬
ছয়. সফলতার সুসংবাদ ২৩৭

তৃতীয় পর্যায়: মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত # ২৪৩

তায়েফে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৪৩
জিনদের সঙ্গে নবিজির সাক্ষাৎ..... ২৪৭
বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির কাছে ইসলামের দাওয়াত ২৫০
যেসব গোত্রের কাছে গিয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন..... ২৫১
মক্কার বাইরের কয়েকজন ইসলাম গ্রহণকারী..... ২৫৩
এক. সুওয়াইদ ইবনু সামিত..... ২৫৩

দুই. ইয়াস ইবনু মুআজ.....২৫৩
তিন. আবু জর গিফারি.....২৫৪
চার. তুফাইল ইবনু আমর আদ দাউসি রাদিয়াল্লাহু আনহু.....২৫৭
পাঁচ. জিমাদ আল আজদি রাদিয়াল্লাহু আনহু.....২৫৮
ইসলামের ছায়াতলে মদিনার ছয় যুবক.....২৫৯
আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে আল্লাহর রাসুলের বিয়ে.....২৬১

ইসরা ও মিরাজ # ২৬২

আকাবার প্রথম বাইআত.....২৭২
মদিনায় ইসলামের দূত.....২৭৪
দাওয়াতি কাজে ঈর্ষণীয় সাফল্য.....২৭৪
আকাবার দ্বিতীয় বাইআত.....২৭৮
আলোচনার সূচনা এবং আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক নবিজিকে মদিনায় নেওয়ার ঝুঁকির ব্যাখ্যা.....২৭৯
বাইআতের ধারাসমূহ.....২৮০
বাইআতের ঝুঁকি নিয়ে জোর আলোচনা.....২৮২
বাইআত সম্পাদন.....২৮৩
১২ জন আমির নির্বাচন.....২৮৪
শয়তান চুক্তির কথা ফাঁস করে দিল!.....২৮৫
কুরাইশদের ওপর হামলা করার জন্য আনসারদের মানসিক প্রস্তুতি.....২৮৬
ইয়াসরিবের নেতৃবৃন্দের সামনে কুরাইশদের ক্ষোভ প্রকাশ.....২৮৬
কুরাইশরা আসল সংবাদ জানতে পারা এবং বাইআতকারীদের ধাওয়া করা.....২৮৭
হিজরতের সর্বপ্রথম দল.....২৮৯
দারুন নাদওয়ায় কুরাইশ নেতাদের এক গোপন বৈঠক!.....২৯৩
কুরাইশের অধিবেশনে নবিজিকে হত্যার প্রস্তাব পাশ.....২৯৫

নবিজির হিজরত # ২৯৮

কুরাইশদের পরিকল্পনা ও আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা.....২৯৮
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে পরিকল্পনা.....২৯৮
নবিজির ঘর ঘিরে ফেলা.....২৯৯
হিজরতের উদ্দেশ্যে নবিজির গৃহত্যাগ.....৩০১
গৃহ থেকে গুহার পথে.....৩০৩

গুহার ভেতরে অলৌকিক ঘটনা..... ৩০৪
মদিনার পথে..... ৩০৮
যাত্রাপথের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৩০৯
অবশেষে মদিনায় আগমন ৩২১

মদিনার যুগ # ৩২৫

দাওয়াত, জিহাদ ও সফলতার যুগ ৩২৫
মদিনার যুগে দাওয়াত ও জিহাদের বিভিন্ন পর্যায়.....৩২৫
হিজরতের সময় মদিনার অধিবাসী ও তাদের অবস্থা ৩২৫

প্রথম পর্যায়: নতুন এক সমাজব্যবস্থার রূপায়ণ # ৩৩৬

মসজিদে নববির নির্মাণ ৩৩৬
মুসলিমদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা.....৩৩৮
ইসলামভিত্তিক মৈত্রীচুক্তি: জাতি গঠনের এক অনন্য অধ্যায়..... ৩৪০
সমাজে এই মৈত্রীচুক্তির প্রভাব ৩৪৩
ইহুদিদের সঙ্গে নতুন এক চুক্তি.....৩৪৭
এই চুক্তির মূল শর্তাবলি ছিল ৩৪৮
সশস্ত্র সংঘাত ৩৪৯
কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ও মুনাফিকদের সঙ্গে তাদের যোগসাজশ ৩৪৯
মাসজিদুল হারামে মুসলিমদের নিষিদ্ধ ঘোষণা.....৩৫১
মুহাজিরদেরকে কুরাইশদের হুমকি ৩৫১
যুদ্ধের অনুমতি ৩৫৩

বদর যুদ্ধের আগের গাজওয়া ও সারিয়্যা # ৩৫৫

১. সারিয়্যাতু সিফিল বাহর বা সমুদ্রতীরে প্রেরিত বাহিনী ৩৫৬
২. সারিয়্যাতু রাবিগ..... ৩৫৬
৩. সারিয়্যাতু খাররার ৩৫৭
৪. গাজওয়ায়ে আবওয়া বা ওয়াদ্দান ৩৫৭
৫. গাজওয়ায়ে বুওয়াত ৩৫৮
৬. গাজওয়ায়ে সাফাওয়ান..... ৩৫৯
৭. গাজওয়ায়ে জুল উশাইরা..... ৩৫৯
৮. সারিয়্যায়ে নাখলা..... ৩৬০

যুদ্ধের কারণ ৩৬৭
মুসলিম বাহিনীর শক্তির পরিমাণ এবং নেতৃত্ব বণ্টন ৩৬৮
বদর অভিমুখে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ৩৬৯
মক্কায় সতর্কবাণী ৩৬৯
যুদ্ধের জন্য মক্কাবাসীর প্রস্তুতি ৩৭০
মক্কাবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা এবং যুদ্ধসরঞ্জাম ৩৭০
বনু বকরকে ঘিরে যত সমস্যা ৩৭০
মক্কাবাহিনীর যাত্রা ৩৭১
আবু সুফিয়ানের কাফেলা বেঁচে গেল ৩৭১
মক্কাবাহিনীর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা ও মতানৈক্য ৩৭২
সংকটের আবর্তে মুসলিম বাহিনী! ৩৭৩
জরুরি পরামর্শ বৈঠক ৩৭৩
তথ্য অনুসন্ধানে নবিজির বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল ৩৭৬
মক্কিবাহিনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ ৩৭৭
রহমতের বৃষ্টিধারা বর্ষণ ৩৭৮
গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্রস্থলের দিকে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা ৩৭৮
নেতৃত্বের কেন্দ্র: নবিজির জন্য শামিয়ানা তৈরি ৩৭৯
সেনাবিন্যাস ও রাত্রিযাপন ৩৮০
মক্কাবাহিনীর পারস্পরিক মতানৈক্য ৩৮১
বদর প্রান্তের মানচিত্র ৩৮৪
দুই বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি ৩৮৪
শেষ মুহূর্ত ও যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন ৩৮৬
মল্লযুদ্ধের আহ্বান ৩৮৬
সর্বাত্মক আক্রমণ ৩৮৮
নবিজির আকুল প্রার্থনা ৩৮৮
ফেরেশতাদের অবতরণ ৩৮৯
পালটা হামলা ৩৯০
রণক্ষেত্র থেকে ইবলিসের পলায়ন ৩৯৩
শোচনীয় পরাজয় ৩৯৩
আবু জাহলের মরিয়া প্রতিরোধ এবং তার করুণ পরিণতি ৩৯৪
আবু জাহল নিহত হওয়ার ঘটনা ৩৯৪
বদর যুদ্ধে ইমানদীপ্ত বিস্ময়কর কিছু ঘটনা ৩৯৭

উভয় দলের নিহতের সংখ্যা ৪০৩
মক্কায় পরাজয়ের দুঃসংবাদ ৪০৫
মদিনায় বিজয়ের সুসংবাদ..... ৪০৮
মদিনার বুকে মুসলিম বাহিনীর প্রত্যাবর্তন.....৪০৯
অভিনন্দন তোমাদের, হে বিজয়ী দল! ৪১১
বন্দিদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ৪১২
বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের পর্যালোচনা ৪১৪

বদর ও উহুদের মধ্যবর্তী সামরিক তৎপরতা # ৪১৭

গাজওয়ায়ে বনু সুলাইম ৪১৮
নবিজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র ৪১৯
বনু কাইনুকার যুদ্ধ..... ৪২২
ইহুদিদের প্রতারণার উদাহরণ ৪২২
বনু কাইনুকার বিশ্বাসঘাতকতা..... ৪২৪
অবরোধ, তারপর আত্মসমর্পণ, অবশেষে নির্বাসন..... ৪২৭
গাজওয়াতুস সাওয়িক.....৪২৮
গাজওয়ায়ে জু আমর..... ৪২৯
কাব ইবনু আশরাফকে হত্যা..... ৪৩০
গাজওয়ায়ে বুহরান ৪৩৬
যায়েদ ইবনুল হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান ৪৩৬

উহুদ যুদ্ধ # ৪৩৯

প্রতিশোধমূলক যুদ্ধের জন্য কুরাইশদের রণপ্রস্তুতি ৪৩৯
কুরাইশ সেনাবাহিনীর পরিসংখ্যান ও নেতৃত্ব ৪৪১
কুরাইশ বাহিনীর যুদ্ধযাত্রা ৪৪১
আকস্মিক হামলা মোকাবিলায় মুসলিমদের সতর্কতা..... ৪৪২
মদিনার উপকণ্ঠে কুরাইশ বাহিনীর উপস্থিতি..... ৪৪২
মদিনার প্রতিরক্ষা গ্রহণে জরুরি বৈঠক ৪৪৩
মুসলিম বাহিনীর বিন্যাস ও যুদ্ধযাত্রা..... ৪৪৪
সৈন্য পর্যবেক্ষণ.....৪৪৬
উহুদ ও মদিনার মধ্যস্থলে রাত্রিযাপন ৪৪৭
সদলবলে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনু উবাইর বিদ্রোহ..... ৪৪৭

উহুদ প্রান্তে অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনী ৪৪৯
পাহাড়চূড়ায় নবিজির অভিনব প্রতিরোধব্যবস্থা..... ৪৫০
মুসলিম বাহিনীকে নবিজির প্রেরণা দান ৪৫২
মক্কা বাহিনীর রণবিন্যাস ৪৫৩
কুরাইশের রাজনৈতিক চাল..... ৪৫৪
কুরাইশদের মাঝে যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টিতে নারীদের ভূমিকা ৪৫৫
যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন..... ৪৫৬
পতাকাকে ঘিরে ভীষণ যুদ্ধ ও পতাকাবাহকদের হত্যা ৪৫৬
ময়দানের অন্যান্য অংশে যুদ্ধের চিত্র..... ৪৫৮
শেরে খোদা হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতবরণ..... ৪৬০
যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ মুসলিমদের হাতে ৪৬২
ফুলশয্যা থেকে সরাসরি জিহাদের ময়দানে ৪৬২
তিরন্দাজ বাহিনীর দুর্দান্ত ভূমিকা ৪৬৩
মুশরিকদের পরাজয় ৪৬৩
তিরন্দাজ বাহিনীর মারাত্মক ভুল ৪৬৫
খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ধরা.....৪৬৬
প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে নবিজির অসীম সাহসিকতা ৪৬৭
ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনী.....৪৬৭
নবিজিকে রক্ষায় সাহাবিদের প্রাণপণ লড়াই.....৪৭০
নবিজির জীবনে সবচেয়ে কঠিন সময় ৪৭১
নবিজির চারপাশে সাহাবিদের সুরক্ষাবলয়.....৪৭৬
মুশরিকদের হামলার প্রকোপ বৃদ্ধি ৪৭৮
বিরল বীরত্বগাথা ৪৭৮
নবিজির শহিদ হওয়ার খবর ও যুদ্ধক্ষেত্রে এর প্রতিক্রিয়া ৪৮১
নবিজির যুদ্ধ অব্যাহত রাখা ও পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ.....৪৮২
উবাই ইবনু খালফকে হত্যা ৪৮৩
নবিজিকে তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর তুলে নেওয়া.....৪৮৪
মুশরিকদের সর্বশেষ আক্রমণ..... ৪৮৫
শহিদদের অঙ্গবিকৃতি..... ৪৮৬
শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে নিতে মুসলিম বাহিনীর তৎপরতা ৪৮৭
ঘাঁটিতে নবিজির আশ্রয় গ্রহণের পর ৪৮৮
যুদ্ধ শেষে আবু সুফিয়ানের বিদ্রুপ ও উমরের জবাব ৪৮৯
আরেকটি বদর যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি..... ৪৯১

মুশরিকদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ..... ৪৯১
শহিদ ও আহতদের সন্ধানে..... ৪৯১
শহিদদের কাফন-দাফন..... ৪৯৪
আল্লাহর দরবারে নবিজির বিশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন ও প্রার্থনা.....৪৯৬
মদিনায় প্রত্যাবর্তন: ত্যাগ ও ভালোবাসার বিরল দৃষ্টান্ত ৪৯৮
মদিনায় এলেন আল্লাহর রাসুল..... ৫০০
নিহতদের পরিসংখ্যান ৫০০
মদিনার উদ্বেগজনক অবস্থা..... ৫০০
হামরাউল আসাদ অভিযান ৫০১
উহুদ যুদ্ধের ওপর কুরআনের আলোকপাত.....৫০৭
উহুদ যুদ্ধের পেছনে হিকমত ও সুমহান লক্ষ্যসমূহ..... ৫০৯

উহুদ ও খন্দক যুদ্ধের মধ্যবর্তী সারিয়্যা ও সামরিক অভিযানসমূহ # ৫১০

সারিয়্যায়ে আবু সালামা ৫১১
সারিয়্যায়ে আব্দুল্লাহ ইবনি উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু..... ৫১২
রাজির হৃদয়বিদারক ঘটনা.....৫১৩
বিরে মাউনার লোমহর্ষক ঘটনা.....৫১৬
বনু নাজিরের যুদ্ধ..... ৫১৯
পাথরচাপা দিয়ে নবিজিকে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ৫২০
নাজদের যুদ্ধ.....৫২৬
দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ ৫২৭
গাজওয়ায়ে দুমাতুল জান্দাল ৫২৮
গাজওয়াতুল আহজাব বা খন্দকের যুদ্ধ..... ৫৩০
বনু কুরাইজার যুদ্ধ.....৫৪৭

বনু কুরাইজা যুদ্ধের পরবর্তী সামরিক অভিযানসমূহ # ৫৫৭

সাল্লাম ইবনু আবিল হুকাইকের হত্যাকাণ্ড.....৫৫৭
সারিয়্যায়ে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা ৫৬০
বনু লাহইয়ানের যুদ্ধ ৫৬২
নবিজির ধারাবাহিক অভিযান..... ৫৬৩
গামর অভিযান..... ৫৬৩
যুল কাসসা অভিযান..... ৫৬৩

যুল কাসসায় পালটা আক্রমণ ৫৬৪
জামুম অভিযান ৫৬৪
ইস অভিযান ৫৬৫
তরিফ (বা তরিক) অভিযান..... ৫৬৬
ওয়াদিল কুরা অভিযান ৫৬৬
খাবত অভিযান ৫৬৭

গাজওয়ায়ে বনু মুস্তালিক বা গাজওয়ায়ে মুরাইসি # ৫৬৯

গাজওয়ায়ে বনু মুস্তালিকের আগে মুনাফিকদের কার্যকলাপ..... ৫৭২
গাজওয়ায়ে বনু মুস্তালিকে মুনাফিকদের ভূমিকা.....৫৭৮
ক. মদিনা থেকে মুহাজিরদের বহিষ্কারের ঘোষণা..... ৫৭৮
খ. ইফকের ঘটনা.....৫৮২
মুরাইসি বা বনু মুস্তালিক যুদ্ধের পরবর্তী অভিযানসমূহ..... ৫৮৯
১. দুমাতুল জান্দালে আব্দুর রহমান ইবনু আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান..... ৫৮৯
২. ফাদাক অভিযানে আলি ইবনু আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫৯০
৩. ওয়াদিল কুরা অভিযানে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু কিংবা যায়েদ ইবনুল হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫৯০
৪. উরাইনা অভিযানে কুরজ ইবনু জাবির ফিহরি ৫৯১

হুদাইবিয়ার সন্ধি # ৫৯৪

উমরার প্রস্তুতি—জিলকদ, ৬ হিজরি ৫৯৪
মুসলিমদেরকে প্রস্তুতির আহ্বান.....৫৯৪
মুসলিমদের মক্কার উদ্দেশে যাত্রা ৫৯৫
কুরাইশ কর্তৃক মুসলিমদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা.....৫৯৬
রক্তক্ষয়ী সংঘাত এড়াতে নবিজির পথ পরিবর্তন.....৫৯৬
বুদাইল ইবনু ওয়ারাকার মধ্যস্থতা ৫৯৭
আল্লাহর রাসুলের কাছে কুরাইশের প্রতিনিধিদল ৫৯৮
‘তিনিই সেই সত্তা যিনি তাদের হাত তোমাদের থেকে নিবৃত্ত করেছেন’ ৬০০
কুরাইশের কাছে প্রতিনিধি হিসেবে উসমান ইবনু আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রেরণ.....৬০১
উসমান হত্যার গুজব ও বাইআতে রিজওয়ান..... ৬০২

সন্ধিচুক্তি ও তার শর্তসমূহ ৬০৪
আবু জান্দাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ফিরিয়ে দেওয়া ৬০৫
উমরা থেকে হালাল হতে পশু কুরবানি ও মাথা মুণ্ডন ৬০৬
মুহাজির নারীদের মক্কায় ফেরত পাঠাতে নবিজির অস্বীকৃতি! ৬০৭
সন্ধির ধারা ও শর্তসমূহের সারসংক্ষেপ ৬০৯
মুসলিমদের মানসিক কষ্ট এবং নবিজির সঙ্গে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আলোচনা ৬১২
দুর্বল মুসলিমদের সমস্যা সমাধান ৬১৩
কুরাইশ বীর সেনাদের ইসলামগ্রহণ ৬১৫

দ্বিতীয় পর্যায়: নতুন যুগের সূচনা # ৬১৬

রাজা বাদশাহ ও শাসকগোষ্ঠীর নিকট পত্রলিখন ৬১৭
১. হাবাশার বাদশাহ নাজাশি বরাবর পত্র ৬১৮
২. মিসর সম্রাট মুকাওকিসের কাছে নবিজির পত্র ৬২২
৩. পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে পত্র প্রেরণ ৬২৫
৪. রোম সম্রাট কাইসারের প্রতি ৬২৭
৫. মুনজির ইবনু সাওয়ির কাছে নবিজির পত্র ৬৩৩
৬. ইয়ামামাপ্রধান হাওজা ইবনু আলির কাছে নবিজির পত্র ৬৩৪
৭. দামেশকের গভর্নর হারিস ইবনু আবি শামির গাসসানি বরাবর নবিজির পত্র ৬৩৫
৮. ওমান সম্রাট বরাবর নবিজির পত্র ৬৩৬

হুদাইবিয়ার সন্ধিপরবর্তী সামরিক তৎপরতা # ৬৪৩

খাইবার ও ওয়াদিল কুরা যুদ্ধ ৬৪৬
যুদ্ধের কারণ ৬৪৬
খাইবারের অভিমুখে যাত্রা ৬৪৭
মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ৬৪৭
ইহুদিদের সঙ্গে মুনাফিকদের যোগাযোগ ৬৪৮
খাইবারের পথে মুসলিম বাহিনী ৬৪৯
পথিমধ্যে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা ৬৫০
খাইবার উপকণ্ঠে মুসলিম বাহিনী ৬৫১
খাইবারের দুর্গসমূহ ৬৫২

মুসলিম বাহিনীর শিবির স্থাপন..... ৬৫৩
চূড়ান্ত প্রস্তুতি ও বিজয়ের সুসংবাদ..... ৬৫৩
যুদ্ধের সূচনা ও নায়িম দুর্গ জয় ৬৫৪
সাব ইবনু মুআজ দুর্গ জয় ৬৫৬
যুবাইর দুর্গ জয় ৬৫৭
উবাই দুর্গ জয়..... ৬৫৮
নাজার দুর্গের পতন ৬৫৮
খাইবারের দ্বিতীয় অংশের বিজয় ৬৫৯
অবশেষে সন্ধির আলাপ আলোচনা ৬৫৯
চুক্তিভঙ্গের দায়ে আবুল হুকাইকের দুই পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড ৬৬০
গনিমতের মাল বণ্টন.....৬৬১
জাফর ইবনু আবি তালিব রা. ও আশয়ারি সাহাবিদের প্রত্যাবর্তন..... ৬৬৩
সাফিয়্যার সঙ্গে শুভ পরিণয় ৬৬৪
বিষমিশ্রিত বকরির ঘটনা ৬৬৫
খাইবার যুদ্ধে উভয় পক্ষে নিহতদের সংখ্যা..... ৬৬৬
ফাদাক জয়..... ৬৬৬
ওয়াদিল কুরা জয়..... ৬৬৬
তাইমা জয় ৬৬৮
মদিনায় প্রত্যাবর্তন ৬৬৮
সারিয়্যায়ে আবান ইবনু সাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু..... ৬৬৯

সপ্তম হিজরির আরও কিছু গাজওয়া ও সারিয়্যা # ৬৭১

গাজওয়ায়ে জাতুর রিকা ৬৭১
উমরাতুল কাজা..... ৬৭৮

মুতার যুদ্ধ # ৬৮৩

যুদ্ধের কারণ..... ৬৮৩
বাহিনীর সেনাপতিগণ ও তাদের প্রতি নবিজির উপদেশ ৬৮৪
মুসলিম বাহিনীকে বিদায় ও আবদুল্লাহ ইবনু রওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কান্না ৬৮৫
ইসলামি সেনাবাহিনীর অগ্রসর হওয়া এবং এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া ৬৮৬
মাআনে জরুরি পরামর্শ সভা..... ৬৮৬

মুসলিম সেনাবাহিনীর শত্রুর দিকে অগ্রসর হওয়া..... ৬৮৭
যুদ্ধের সূচনা এবং মুসলিম সেনাপতিদের একের পর এক শাহাদাতবরণ ৬৮৭
অবশেষে আল্লাহর এক তরবারির হাতে যুদ্ধের পতাকা..... ৬৮৯
যুদ্ধের সমাপ্তি..... ৬৯০
নিহতদের পরিসংখ্যান ৬৯১
যুদ্ধের প্রভাব ৬৯১
জাতুস সালাসিল অভিযান ৬৯২
খাজিরা অভিযান ৬৯৪

মক্কা বিজয় # ৬৯৫

মক্কা অভিযানের কারণ..... ৬৯৫
সন্ধি নবায়নে আবু সুফিয়ানের মদিনায় ছুটে যাওয়া..... ৬৯৮
যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং তা গোপন রাখার চেষ্টা..... ৭০১
মক্কা অভিমুখে মুসলিম বাহিনী..... ৭০৪
মাররুজ জাহরানে মুসলিম সেনাদল..... ৭০৬
আল্লাহর রাসুলে সমীপে আবু সুফিয়ান ইবনু হারব..... ৭০৬
মাররুজ জাহরান ছেড়ে মক্কার অভিমুখে মুসলিম বাহিনী ৭০৯
কুরাইশের দোরগোড়ায় মুসলিম বাহিনী..... ৭১০
জু-তুওয়ার বুকে মুসলিম বাহিনী ৭১১
মুসলিম বাহিনীর মক্কায় প্রবেশ ৭১২
নবিজির কাবাঘরে প্রবেশ এবং মূর্তি অপসারণ..... ৭১৩
কাবাঘরে নবিজির সালাত আদায়, তারপর কুরাইশদের সামনে ভাষণ ৭১৪
আজ তোমাদের প্রতি কোনো অভিযোগ নেই!..... ৭১৫
কাবাঘরের চাবি অর্পণ..... ৭১৫
কাবার ছাদে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর আজান..... ৭১৬
বিজয় বা শোকরানার সালাত আদায়..... ৭১৭
দাগি আসামিদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা..... ৭১৭
সাফওয়ান ও ফাজালার ইসলামগ্রহণ ৭১৯
মক্কা বিজয়ের পরদিন আল্লাহর রাসুলের ভাষণ ৭১৯
আনসারদের মনে নবিজির মক্কায় থেকে যাওয়ার ভয়..... ৭২১
বাইআত গ্রহণ..... ৭২১
নবিজির মক্কায় অবস্থান এবং বিভিন্ন কার্যক্রম ৭২৩
অভিযানী দলসমূহ ও প্রেরিত প্রতিনিধি দলসমূহ ৭২৪

তৃতীয় পর্যায়: পূর্ণতার প্রান্তে নবুওয়াতের যাত্রা # ৭২৯

হুনাইনের যুদ্ধ ৭৩০
শত্রুদের অভিযাত্রা ও আওতাসে অবতরণ ৭৩০
সেনাপতির সিদ্ধান্তে অভিজ্ঞ এক বুড়ো যোদ্ধার আপত্তি ৭৩০
মালিক ইবনু আউফের গুপ্তচর প্রেরণ ৭৩২
নবিজির গোয়েন্দা ৭৩২
মক্কা থেকে হুনাইনের পথে যাত্রা ৭৩২
শত্রুর অতর্কিত হামলার মুখে মুসলিম বাহিনী ৭৩৪
মুসলিম বাহিনীর ঘুরে দাঁড়ানো ৭৩৬
পিছু ধাওয়া.....৭৩৭
বিপুল পরিমাণ গনিমতের মাল ৭৩৮
তায়েফ যুদ্ধ ৭৩৯
জিরানায় গনিমত বণ্টন ৭৪২
আনসারদের মনঃক্ষুণ্ণতা.....৭৪৩
হাওয়াজিন প্রতিনিধিদলের আগমন.....৭৪৫
উমরা ও মদিনায় প্রত্যাবর্তন..... ৭৪৭

মক্কা বিজয়ের পরবর্তী অভিযান ও প্রেরিত প্রতিনিধি দলসমূহ # ৭৪৮

জাকাত উসুলকারী দল.....৭৪৮
এ সময়কার কয়েকটি অভিযান.....৭৫০
১. বনু তামিম অভিযান ৭৫০
২. খাসআম অভিযান ৭৫১
৩. বনু কিলাব অভিযান: দাওয়াত থেকে সংঘর্ষে.....৭৫১
৫. জেদ্দা উপকূলীয় অভিযান.....৭৫২
৬. তাঈ অভিযান ও ফুলস মূর্তির ধ্বংস.....৭৫২

তাবুক যুদ্ধ # ৭৫৬

যুদ্ধের কারণ.....৭৫৬
রোমান ও গাসসানিদের প্রস্তুতি সম্পর্কে ব্যাপক সংবাদ ৭৫৭
রোমান ও গাসসানিদের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিশেষ সংবাদ.....৭৫৯
পরিস্থিতির চরম প্রতিকূলতা..... ৭৬০
আক্রমণের সিদ্ধান্ত ৭৬০

রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতির ঘোষণা ৭৬১
যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণে সাহাবিদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা ৭৬১
তাবুকের পথে যাত্রা মুসলিম বাহিনীর ৭৬৩
তাবুকে মুসলিম বাহিনীর আগমন ৭৬৫
বিজয়ীর বেশে মদিনা প্রত্যাবর্তন ৭৬৭
তাবুক যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেননি ৭৬৯
তাবুক যুদ্ধের প্রভাব ৭৭২
তাবুক অভিযানের পটভূমিতে কুরআনের অবতরণ ৭৭৩

নবম হিজরির উল্লেখযোগ্য ঘটনা # ৭৭৪

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর নেতৃত্বে হজ পালন ৭৭৫
নবিজির অভিযান ও গাজওয়াসমূহের ওপর একনজর ৭৭৬
দলে দলে মানুষ ইসলামের ছায়াতলে ৭৮০
বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন ৭৮১
১—আব্দুল কাইস গোত্রের প্রতিনিধিদল ৭৮২
২—দাউস গোত্রের প্রতিনিধিদল ৭৮২
৩—ফারওয়া ইবনু আমর আল জুজামি রাদিয়াল্লাহু আনহুর দূত ৭৮৩
৪—সুদা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৭৮৩
৫—কাব ইবনু জুহাইর ইবনি আবি সালামার আগমন ৭৮৪
৬—উজরা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৭৮৭
৭—বালি গোত্রের প্রতিনিধিদল ৭৮৮
৮—সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদল ৭৮৮
৯—ইয়েমেনের সম্রাটগণের পক্ষ থেকে চিঠি ৭৯১
১০—হামাদানের প্রতিনিধিদল ৭৯২
১১—বনু ফাজারার প্রতিনিধিদল ৭৯৩
১২—নাজরানের প্রতিনিধিদল ৭৯৪
১৩—বনু হানিফা গোত্রের প্রতিনিধিদল ৭৯৬
১৪—বনু আমির ইবনু সাসাআর প্রতিনিধিদল ৭৯৮
১৫—তুজিব গোত্রের প্রতিনিধিদল ৭৯৯
১৬—তাঈ গোত্রের প্রতিনিধিদল ৮০০
দাওয়াতি কাজে সফলতা ও তার ফলাফল ৮০২

বিদায় হজ # ৮০৬

নবিজির পাঠানো সর্বশেষ সামরিক বাহিনী.....৮১৫

প্রিয়তমের সান্নিধ্যে # ৮১৭

বিদায়ের লক্ষণসমূহ.....৮১৭
অসুস্থতার সূচনা ৮১৮
জীবনের শেষ সপ্তাহ ৮১৮
মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে ৮১৯
ওফাতের চার দিন আগে.....৮২১
ওফাতের তিন দিন আগে ৮২৩
ওফাতের দুয়েক দিন আগে..... ৮২৩
ওফাতের মাত্র এক দিন আগে..... ৮২৩
নবিজির জীবনের শেষ দিন.....৮২৪
বিদায়বেলার অন্তিম মুহূর্ত..... ৮২৬
শোকে মোহ্যমান পৃথিবী ৮২৭
নবিজির ওফাতের পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য..... ৮২৮
নবিজির ওফাতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর অবস্থান ৮২৮
কাফন-দাফন এবং অন্যান্য কার্যক্রম ৮৩০

নবিজির পরিবার পরিজন # ৮৩২

নবিজির দাসীগণ ৮৩৫
নবিজির একাধিক বিয়ের হিকমাহ.....৮৩৬

নবিজির বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি # ৮৪৪

নবিজির দৈহিক সৌন্দর্য..... ৮৪৫
নবিজির চরিত্রমাধুরী.....৮৫১

লেখকের জীবনী # ৮৬০

গ্রন্থ সম্পর্কে

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلِ الرُّسُلِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ، وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اِهْتَدٰى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ.

এই গ্রন্থের মাধ্যমে আমি রাবিতা আল-আলমি আল-ইসলামি (বিশ্ব ইসলামি সংস্থা) কর্তৃক আয়োজিত আন্তর্জাতিক সিরাহ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। রবিউল আউয়াল ১৩৯৬ হিজরি মোতাবেক ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের কথা। রাবিতা আল-আলমি আল-ইসলামি পাকিস্তানে প্রথম সিরাত সম্মেলনের আয়োজন করে এবং সেখান থেকে তারা এই প্রতিযোগিতার ঘোষণা দেয়।

আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটিকে এমন গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন, যা আমি রচনার সময় কল্পনাও করিনি। এটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে এবং বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ পাঠক উভয়ের কাছেই এমনভাবে সমাদৃত হয়, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।

এই গ্রন্থের সূচনা সম্পর্কে বলতে গেলে—আমি প্রতিযোগিতার জন্য রাবিতার ঘোষণাটি যথাসময়ে দেখিনি। পরে যখন দেখলাম, তখনও অংশগ্রহণ করার কোনো আগ্রহ জন্মায়নি; বরং এ প্রস্তাবকে একেবারেই প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু তাকদির আমাকে এ কাজের দিকে টেনে আনে।[১] প্রতিযোগিতার জন্য পাণ্ডুলিপি গ্রহণের শেষ তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৩৯৭ হিজরির মুহাররম মাসের শুরুতে। অর্থাৎ ঘোষণার সময় থেকে প্রায় নয় মাস পর। কিন্তু এর মধ্যে কয়েক মাস আমার অপচয় হয়ে যায়, আর বাকি যে সময় ছিল, সেটাও গ্রন্থ রচনার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তবুও কাজ শুরু করার সংকল্প করি এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করে কোমর বেঁধে নেমে পড়ি। শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজটি শেষ করে জমা দিতে সক্ষম হই।

---

[১] শাইখ মাহমুদ আল-মাল্লাহ বলেন, এই বাক্যে তাকদিরকে সরাসরি কাজের কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। লেখক এখানে রূপকধর্মী অভিব্যক্তি ব্যবহার করেছেন। তবে উত্তম হতো, যদি এই কাজটিকে তিনি 'তাকদির'-এর সাথে সম্পৃক্ত না করে সরাসরি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করতেন। [দেখুন, আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম, পৃষ্ঠা নং ৩৩১]

তবে স্বল্প সময় ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে আমি নানাবিধ সংকটে পড়েছিলাম—গ্রন্থসূত্রের অভাব, সবকিছু ঘেঁটে দেখার সুযোগ না পাওয়া ইত্যাদি। অথচ আমার কাছে যথার্থতা ও নির্ভুলতা ছিল সবচেয়ে বড় শর্ত। তারপরও আমি অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ ও বাড়তি আলাপ এড়িয়ে যত দূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচ্য বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেছি। তবুও কোথাও কোথাও এমন শূন্যতা টের পেয়েছি, যেখানে আরও সংযোজন প্রয়োজন ছিল; কিন্তু তখন আমার পক্ষে তা করা সম্ভব হয়নি। ফলে যা কিছু হাতে ছিল, দ্রুত খসড়া আকারে লিখে, পরে তা কোনো রকম সংশোধন বা পরিমার্জনা ছাড়াই নকল আকারে জমা দিতে হয়েছে।

কিন্তু মনে সবসময়ই ছিল সেই শূন্যতা পূরণের আকাঙ্ক্ষা, কিছু সংযোজন করার ইচ্ছা। কিন্তু দিন কেটে বছর পার হয়ে গেলেও সে সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি। এভাবে সময় গড়িয়ে গেল, লাগাম হাতছাড়া হয়ে গেল। অবশ্য আমি সময় সময় বইটিতে কিছু বিষয় সংযোজন করেছি, কোথাও-বা আগে-পরে এনেছি, কোনো কোনো জায়গায় সংযোজন বা সংশোধন করেছি। যদিও এগুলো পাণ্ডুলিপি তৈরির সময়ের মনে জাগা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নয়, তবুও আশা করি সিরাতের আলোচনায় তা উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ।

পাশাপাশি এই সময়ে আমি পূর্ববর্তীদের রচিত প্রাচীন কিছু গ্রন্থ হাতে পেয়েছি, যা পাণ্ডুলিপি রচনার সময় আমি যে আধুনিক যুগে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়েছিলাম, সেগুলোর তুলনায় যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। আল্লাহর তাওফিকে আমি এই সংস্করণে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আমি আশা করেছিলাম, কিছু মূল্যবান গবেষণামূলক পর্যবেক্ষণ প্রকাশিত হবে, যেগুলো থেকে আমি প্রধান কয়েকটি বিষয়ে উপকৃত হতে পারব। কিন্তু যে মন্তব্য ও পর্যালোচনাগুলো আমার কাছে এসেছে, তার অধিকাংশই মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়; বরং তুচ্ছ ও গৌণ প্রসঙ্গে সীমাবদ্ধ, যা থাকলেও বিশেষ উপকার নেই, না থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। এর সঙ্গে এ-ও যুক্ত করতে হয়, সেগুলোর বেশিরভাগই ছিল স্পষ্ট ভুলে ভরা; বরং এমন অদ্ভুতরকমের বিভ্রান্তিপূর্ণ, যা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তো দূরের কথা, সাধারণ গবেষকদের কাছ থেকেও প্রত্যাশিত নয়।

এই সংস্করণে যে সংযোজন ও সংশোধন করা হয়েছে, তা পূর্ববর্তী সংস্করণগুলোর তুলনায় নিঃসন্দেহে উত্তম ও অধিক উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। এটিই হলো একমাত্র অনুমোদিত সংস্করণ, যাতে লেখকের সংশোধন ও সংযোজন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর আগে রাবিতার পক্ষ থেকে বইটি বহুবার প্রকাশিত হয়েছে, আবার কিছু ভাই অনুমতি নিয়ে লেখকের তরফ থেকে ছাপিয়েছেন। কিন্তু এরপর অসংখ্য

অনুমতিহীন সংস্করণ বাজারে এসেছে, যা সম্পূর্ণ অবৈধ। প্রকাশকরা লেখককে কিছুই জানায়নি, বরং বইটির সুনামকে পুঁজি করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাহস করে বইটির স্বত্বাধিকারও নিজের নামে লিখে নিয়েছে! আল্লাহ তাদের হিদায়াত দিন, যেন তারা সত্যের পথে ফিরে আসে এবং হকদারকে তার হক পৌঁছে দেয়—সেই দিন আসার আগেই, যে-দিন না থাকবে কোনো কেনাবেচা, না থাকবে কোনো বন্ধুত্ব।

আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের ওপর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক।

১৮ই রবিউল আউয়াল ১৪১৫ হিজরি
২৬শে আগস্ট ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দ
সফিউর রহমান মুবারকপুরি
ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মদিনা মুনাওয়ারা

ড. আব্দুল্লাহ উমর নাসিফের ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যার অনুগ্রহে সমস্ত ভালো কাজ পূর্ণতা লাভ করে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল এবং তাঁর মনোনীত বন্ধু। তিনি তাঁর উপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। আসমানি আমানত পৌঁছে দিয়েছেন। উম্মাহর কল্যাণে আন্তরিক উপদেশ দিয়েছেন এবং তাদের এমন সুস্পষ্ট পথের (শরিয়তের) উপর রেখে গেছেন, যার রাতও দিনের মতো আলোকোজ্জ্বল। দুরুদ ও সালাম তাঁর উপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবায়ে কেরামের উপর। যারা তাঁর প্রদর্শিত বিধানের অনুসরণ করবে এবং সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে, কিয়ামত পর্যন্ত আসন্ন সে সকল লোকের উপর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির বারিধারা বর্ষিত হোক। হে সর্বোচ্চ দয়াময়, তাদের সঙ্গে আমাদের উপরও আপনি আপনার ক্ষমা ও সন্তুষ্টির বারিধারা বর্ষণ করুন!

হামদ ও সালাতের পর, আল্লাহর রাসুলের পবিত্র জীবনাদর্শ হচ্ছে এক নিত্যনবীন দান ও চিরন্তন মানবিক আদর্শের পথনির্দেশ, যা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এটি এমন এক বিষয়, যার প্রতি আগ্রহীরা ছুটে যায়, প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করে এবং যার বিষয়ে আলোচনা, গ্রন্থ রচনা ও গবেষণা চলে আসছে তাকে রাসুল হিসেবে প্রেরণের সময় থেকে এবং যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতেই থাকবে। এই পবিত্র জীবনাদর্শ মুসলিমদের জন্য একটি বাস্তবধর্মী আদর্শ ও কর্মসূচি নির্ধারণ করে দেয়—যার মাধ্যমে তাঁদের আচরণ, কর্ম, বাক্য এবং আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক, এরপর পরিবার, আত্মীয়, ভাই, উম্মত ও সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا.

‘তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য আল্লাহর রাসুলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ [সুরা আহযাব : ২১]

আম্মাজান আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে আল্লাহর রাসুলের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ.

পবিত্র কুরআনই ছিল তার চরিত্র।[২]

অতএব, এতে কোনো সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি দুনিয়া-আখিরাতের সমস্ত বিষয়ে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে তাঁর সন্তুষ্টি নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চায়, তাকে অবশ্যই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

তাঁর সিরাত তথা জীবনচরিত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও অনুধাবন করতে হবে; এই দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে যে, এই আল্লাহপ্রদত্ত বিধানই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বাস্তব জীবনে পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করে গেছেন—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অবস্থায়।

তাঁর এই জীবনচরিতেই রয়েছে নেতা ও অনুসারী, শাসক ও প্রজা, উপদেশদাতা ও দিকনির্দেশক, মুজাহিদ ও সংস্কারক—সবার জন্য পথনির্দেশ। রয়েছে মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রের জন্য উত্তম আদর্শ—রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায়, অর্থনীতি ও সম্পদ ব্যবস্থাপনায়, সমাজ ও মানবিক সম্পর্ক গঠনে, নৈতিকতা ও চরিত্রে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনীতিতে।

আজ মুসলিমরা এই মহান আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়ে অজ্ঞতা ও পশ্চাৎপদতার গহ্বরে পতিত হয়েছে। তাই তাদের উচিত, সঠিক পথে ফিরে আসা এবং সিরাতুন নবিকে তাদের পাঠ্যক্রম ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেওয়া—এমনভাবে নয় যে, এটি শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত সম্বল, বরং এটি আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়ার একমাত্র পথ এবং এতে রয়েছে মানবতার শুদ্ধি ও সফলতা। বস্তুত সিরাতুন নবি হচ্ছে আল-কুরআনের বাস্তব অনুবাদ, আচরণ ও চরিত্রে রূপান্তরের একটি প্রামাণ্য ও শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতি। এর মাধ্যমে একজন মুমিন এমন পর্যায়ে পৌঁছায়, যেখানে সে আল্লাহর শরিয়তের অধীন হয়ে যায় এবং শরিয়তকে নিজের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যকর করে—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় সব ক্ষেত্রে।

---

[২] মুসানাদু আহমাদ : ২৫৮১৩, হাদিসটি মুসনাদের ভাষ্য অনুযায়ী। মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৪৮৬২, ইমাম তহাবি 'শরহু মুশকিলিল আছার' গ্রন্থে (হাদিস নং ৪৪৩৫) দীর্ঘভাবে উল্লেখ করেছেন।

এই গ্রন্থ (আর রাহিকুল মাখতুম) একটি চমৎকার প্রয়াস এবং এর লেখক শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরির এক অনন্য কীর্তি। তিনি 'রাবিতা আল-আলমি আল-ইসলামি'-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৩৯৬ হিজরিতে আয়োজিত সিরাতুন্নবি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং প্রথম পুরস্কার লাভ করেন, যা প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে সম্মানিত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল-হারাকান রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন—তিনি ছিলেন রাবিতার সাবেক মহাসচিব। আল্লাহ তাঁকে তাঁর রহমতের ছায়ায় রাখুন এবং আমাদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন।

এই গ্রন্থটি নিয়ে মানুষের আগ্রহ ছিল প্রবল এবং তাদের প্রশংসা ছিল সুগন্ধময় ফুলের মতো। তাই প্রথম সংস্করণের সব কপি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়।

তৃতীয় সংস্করণের জন্য আমাকে ভূমিকা লেখার অনুরোধ করা হয়, আর আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে তা গ্রহণ করি।

আমি মহান আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন এই কাজকে শুধু তাঁরই জন্য খালিস করে দেন এবং মুসলমানদের জন্য তা উপকারী করে তোলেন, যাতে তাদের দুরবস্থা উন্নতির দিকে পরিবর্তিত হয় এবং মহান আল্লাহর সেই বাণী যেন হয় তাদের অবস্থার প্রতিফলন, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

তোমরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে ... ... । [সুরা আলে ইমরান : ১১০]

আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক সেই মহান ব্যক্তির ওপর, যিনি বিশ্বজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন—তিনি হিদায়াতের রাসুল, মানবজাতিকে মুক্তি ও সফলতার পথে পথপ্রদর্শক। তাঁর পরিবার, সাহাবিগণ এবং তাঁর অনুসারীদের ওপরও শান্তি ও বরকত বর্ষিত হোক।

ড. আবদুল্লাহ উমর নাসিফ
সাবেক মহাসচিব, রাবিতা আল-আলমি আল-ইসলামি।
সহ-সভাপতি, শূরা পরিষদ, সৌদি আরব।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল-হারাকান রাহিমাহুল্লাহর ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা, আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, অন্ধকার ও আলোর নির্মাতা। আল্লাহর দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যিনি মানবজাতিকে সুসংবাদ দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মানবজাতিকে গোমরাহি থেকে মুক্ত করেছেন এবং সিরাতুল মুসতাকিমের পথে পরিচালিত করেছেন—আল্লাহর সেই পথ, যার মালিক তিনিই, যাঁর হাতে রয়েছে আসমান ও জমিনের সবকিছু। বস্তুত আল্লাহর দিকেই হবে সবকিছুর প্রত্যাবর্তন।

এরপর...

যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর রাসুলকে শাফাআত ও উচ্চ মর্যাদা দান করলেন এবং মুসলিমদের অন্তরে তাঁর ভালোবাসা সঞ্চার করলেন এবং তাঁর অনুসরণকে আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন বানালেন—যেমন তিনি বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ.

‘বলো: যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো—আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন।’ [আলে ইমরান: ৩১]

তখন এই আয়াতসহ আরও অনেক কারণই মানুষের হৃদয় নবিজির ভালোবাসার দিকে আকৃষ্ট করে এবং মানুষ তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় করার উপায় খুঁজে বেড়ায়। তেমনই একটি উপায় হলো নবিজির সৌন্দর্য ও গুণাবলি প্রকাশ এবং তাঁর পবিত্র সিরাত রচনা করতে প্রতিযোগিতা করা, যা চলে আসছে ইসলামি ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকেই। আর সিরাত বলতে বোঝায় নবিজির কথা, কাজ এবং মহৎ চরিত্র। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন,

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ.

‘পবিত্র কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।’[৩]

আর এ তো জানা কথা যে, পবিত্র কুরআন হলো আল্লাহর কিতাব ও পূর্ণাঙ্গ বাণী। যে ব্যক্তি কুরআনের মতো চরিত্র ধারণ করে, সে-ই হয় মানবজাতির মধ্যে সর্বোত্তম, সর্বাঙ্গসুন্দর এবং সবার ভালোবাসার যোগ্যতম ব্যক্তি।

মুসলিমরা এই মূল্যবান ভালোবাসা আঁকড়ে ধরে রেখেছে, যার ফলস্বরূপ ১৩৯৬ হিজরিতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক সিরাত সম্মেলন। এই সম্মেলনে ‘রাবিতাতুল আলমিল ইসলামি’ ঘোষণা করে, নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে সিরাতুন্নবি বিষয়ক সেরা পাঁচটি গবেষণামূলক রচনাকে মোট ১,৫০,০০০ সৌদি রিয়াল পুরস্কার প্রদান করা হবে। শর্তগুলো হচ্ছে:

১. গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ হতে হবে এবং ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো সময়ানুক্রমে সাজানো থাকতে হবে।

২. গবেষণাটি উচ্চমানসম্পন্ন এবং পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি এমন হতে হবে।

৩. গবেষককে সব পাণ্ডুলিপি ও প্রামাণ্য সূত্র উল্লেখ করতে হবে, যেগুলোর ভিত্তিতে তিনি গবেষণাটি লিখেছেন।

৪. গবেষককে নিজ জীবনের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তারিত পরিচিতি লিখতে হবে, যার মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও রচিত গ্রন্থসমূহ (যদি থাকে) উল্লেখ করতে হবে।

৫. গবেষণাটি পরিষ্কার হস্তলিখনে লিখতে হবে। টাইপ করা হলে তা আরও উত্তম।

৬. আরবিসহ যেকোনো ব্যবহৃত ভাষায় লেখা গবেষণাপত্র গ্রহণ করা হবে।

৭. গবেষণাপত্র ১৩৯৬ হিজরির রবিউস সানির প্রথম দিন থেকে গ্রহণ শুরু হবে। শেষ হবে ১৩৯৭ হিজরির পহেলা মুহাররম।

৮. গবেষণাপত্রটি মক্কা মুকাররমায় রাবিতাতুল আলমিল ইসলামির সাধারণ কার্যালয়ে একটি সিল করা খামে জমা দিতে হবে। রাবিতা তাতে একটি ধারাবাহিক নম্বর সংযুক্ত করে সংরক্ষণ করবে।

৯. গবেষণাগুলো এই বিষয়ে অভিজ্ঞ শীর্ষস্থানীয় আলিমদের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি দ্বারা যাচাই-বাছাই করা হবে।

---

[৩] মুসানাদু আহমাদ : ২৫৮১৩, হাদিসটি মুসনাদের ভাষ্য অনুযায়ী। মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৪৮৬২, ইমাম তহাবি ‘শরহু মুশকিলিল আছার’ গ্রন্থে (হাদিস নং ৪৪৩৫) দীর্ঘভাবে উল্লেখ করেছেন।

রাবিতার এই ঘোষণা ছিল এমন এক প্রেরণা, যা তাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতার আগ্রহ সৃষ্টি করে, যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নবিজির ভালোবাসা লাভ করেছেন। রাবিতাও আরবি, ইংরেজি, উর্দু ও অন্য যে কোনো ভাষার গবেষণাপত্রগুলোকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। বিভিন্ন ভাষায় লেখা একের পর এক গবেষণাপত্র জমা হতে থাকে, যার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১৭১টি। এর মধ্যে: ৮৪টি ছিল আরবি ভাষায়, ৬৪টি উর্দু ভাষায়, ২১টি ইংরেজি ভাষায়, ১টি ফরাসি ভাষায় এবং ১টি হাউসা[৪] ভাষায়।

এই গবেষণাপত্রগুলো পর্যালোচনা ও নিরীক্ষণ এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের ক্রম নির্ধারণ করতে রাবিতা শীর্ষস্থানীয় আলিমদের নিয়ে একটি উচ্চতর কমিটি গঠন করে। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ছিল নিম্নরূপ:

১. **প্রথম পুরস্কার** : শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরি, জামিয়া সালাফিয়া, ভারত। পুরস্কারের পরিমাণ: ৫০,০০০ সৌদি রিয়াল।

২. **দ্বিতীয় পুরস্কার :** ড. মাজিদ আলি খান, জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া, নয়াদিল্লি। পুরস্কারের পরিমাণ: ৪০,০০০ সৌদি রিয়াল।

৩. **তৃতীয় পুরস্কার :** ড. নাসির আহমদ নাসির, পাকিস্তানের জামিয়া ইসলামিয়া-র প্রধান। পুরস্কারের পরিমাণ: ৩০,০০০ সৌদি রিয়াল।

৪. **চতুর্থ পুরস্কার :** উস্তায হামিদ মাহমুদ মুহাম্মাদ মনসুর, লিমুদ, মিশর। পুরস্কারের পরিমাণ: ২০,০০০ সৌদি রিয়াল।

৫. **পঞ্চম পুরস্কার :** উস্তায আব্দুস সালাম হাশিম হাফিজ, মদিনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব। পুরস্কারের পরিমাণ: ১০,০০০ সৌদি রিয়াল।

রাবিতাতুল আলমিল ইসলামি ১৩৯৮ হিজরির শাবান মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক সিরাত সম্মেলনে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে। এই ঘোষণা সমস্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষে রাবিতার সদর দপ্তর মক্কা মুকাররমায় একটি জমকালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যা অনুষ্ঠিত হয় সৌদি রাজপরিবারের সম্মানিত সদস্য প্রিন্স সৌদ ইবনু আবদিল মুহসিন ইবনি আবদিল আজিজ-এর পৃষ্ঠপোষকতায়, তিনি ছিলেন মক্কা অঞ্চলের ডেপুটি গভর্নর এবং তিনি প্রিন্স

---

[৪] হাউসা ভাষা (Hausa বা هَوْسَ) হলো পশ্চিম আফ্রিকার অন্যতম বৃহৎ ও প্রভাবশালী ভাষা, যা মূলত নাইজেরিয়া ও নাইজার দেশজুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে বেশি হাউসা ভাষাভাষী নাইজেরিয়াতে। তারপর নাইজারে। এছাড়া ঘানা, ক্যামেরুন, চাদ, বেনিন, সুদান ও সেনেগালেও হাউসা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী রয়েছে।

ফাওয়াজ বিন আব্দুল আজিজ-এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, যিনি ছিলেন মক্কা অঞ্চলের গভর্নর।

এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় শনিবার ১২ রবিউল আউয়াল ১৩৯৯ হিজরি। এই অনুষ্ঠানে প্রিন্স সৌদ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে রাবিতার সেক্রেটারির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষণাগুলো বিভিন্ন ভাষায় ছাপা ও প্রকাশ করা হবে। এই ঘোষণার বাস্তবায়নে প্রথম প্রকাশনা হিসেবে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শাইখ সফিউর রহমান মুবারকপুরির গবেষণা, যিনি ভারতের জামিয়া সালাফিয়া-র পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত গবেষণাগুলোও পর্যায়ক্রমে ছাপা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সকল কাজকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য খালিস করে দেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক ও সাহায্যকারী।

আল্লাহর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের ওপর।

মুহাম্মাদ ইবনু আলি আল-হারাকান
সাবেক মহাসচিব, রাবিতা আল-আলম আল-ইসলামি, মক্কা মুকাররমা।

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি তাঁর রাসুলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি একে সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন। তিনি তাঁকে করেছেন সাক্ষী, সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপস্বরূপ। তিনি তাঁর মাঝে রেখেছেন উত্তম আদর্শ, সেই ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও পরকালের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। হে আল্লাহ, আপনি তাঁর ওপর, তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের ওপর দয়া, শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন এবং কিয়ামত পর্যন্ত যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের অনুসরণ করেছেন তাদের ওপরও। আপনি তাদের জন্য আপনার রহমত ও সন্তুষ্টির ঝরনা প্রবাহিত করুন।

পর কথা হলো, আমার জন্য অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয় যে, ১৩৯৬ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত রাবেতায়ে আলমে ইসলামির সিরাতুন্নবি সম্মেলন থেকে সিরাত বিষয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ঘোষণা করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল, লেখকদের চিন্তাচেতনার ঐক্য গঠন এবং তাদের জ্ঞান গবেষণা ও সাধনা সুবিন্যস্তকরণ। আমি মনে করি, এটা এমন প্রশংসনীয় উদ্যোগ, যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কারণ, যদি আমরা সিরাতের দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিই, তাহলে দেখতে পাই—প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত ও তাঁর উত্তম আদর্শই হলো সেই একমাত্র উৎস, যেখান থেকে ইসলামি জগতের জীবনীশক্তি ও মানবসমাজের সুখ-সমৃদ্ধির ধারাপাত ঘটে।

এই মুবারক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারাটা আমার জন্য ছিল অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি কি এমন কেউ, যে প্রথম ও শেষ সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মানবের জীবনচরিতের ওপর আলো ফেলতে পারি! সেই জ্ঞান ও বিদ্যা আমার কোথায়! আমি তো একজন ক্ষুদ্র মানুষ, যে তাঁর আলো থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারাটাকেই নিজের সৌভাগ্য ও সফলতা মনে করে, যাতে সে অন্ধকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে না যায়, বরং তাঁর একজন উম্মত হিসেবে বাঁচে এবং তাঁর উম্মতের একজন হিসেবেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, আর আল্লাহ তাঁর শাফায়াতের বরকতে তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।

এখানে এ গ্রন্থের রচনাশৈলী সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি, লেখাটি লিখতে বসার আগে আমি স্থির করেছিলাম, এটি হবে মাঝারি আকারের। এমন নয় যে অতিরিক্ত দীর্ঘ হয়ে পাঠকের বিরক্তি জাগাবে, আবার এত সংক্ষিপ্তও নয় যে মূল বক্তব্য, প্রয়োজনীয় অর্থ ও তাৎপর্য হারিয়ে যাবে। তবে আমি দেখতে পেলাম, সিরাত-সংক্রান্ত বিভিন্ন উৎসগ্রন্থে ঘটনাবলির ক্রম ও খুঁটিনাটি বিবরণে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এরকম জায়গাগুলোয় আমি গভীর অনুসন্ধান চালিয়েছি, সব দিক থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখেছি। তারপর যে তথ্যটি আমার কাছে যাচাই-বাছাইয়ের পর অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে, সেটিকেই মূল লেখায় স্থান দিয়েছি।

তবে প্রতিটি তথ্যের দলিল প্রমাণ পৃথকভাবে উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি, কেননা এতে বইয়ের কলেবর অপ্রয়োজনীয়ভাবে বেড়ে যেতে পারে। রিওয়ায়াত গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে আমি নির্ভর করেছি সূক্ষ্ম বিচারদৃষ্টিসম্পন্ন ইমামগণের লিখিত বক্তব্যের ওপর। তারা কোনো রিওয়ায়াতকে সহিহ, হাসান বা দুর্বল হিসেবে যে রায় দিয়েছেন, আমি সেটিকেই গ্রহণ করেছি। কারণ, এ বিষয়ে আলাদাভাবে গবেষণার জন্য আমার কাছে পর্যাপ্ত সময় ছিল না। হ্যাঁ, কোথাও কোথাও দালায়েল ও উজুহে তারজিহ (প্রমাণ ও প্রাধান্য নির্ধারণের দিক) নির্দেশ করেছি, যখন মনে হয়েছে আমার পর্যালোচনামূলক আলোচনা যথেষ্ট নয়, পাঠক বিভ্রান্ত হবে, বা যেখানে দেখেছি পূর্বসূরি ও পরবর্তীদের মধ্যে একটি বিষয়ে প্রায় সর্বসম্মত মত গঠিত হয়েছে, অথচ তা সঠিক নয়।

হে আল্লাহ! আপনি দুনিয়া ও আখিরাতে আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ করে দিন। আপনি তো পরম ক্ষমাশীল, প্রেমময়, মহান আরশের অধিপতি।

জুমার দিন | ২৪শে রজব ১৩৯৬ হিজরি | ২৩শে জুলাই ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ

সফিউর রহমান মুবারকপুরি

জামিয়া সালাফিয়া, বেনারস, ভারত

অনুবাদকের কথা

আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরি (মৃত্যু: ১০ই জিলকদ ১৪২৭ হিজরি মোতাবেক পহেলা ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রি.) রাহিমাহুল্লাহ রচিত *আর রাহিকুল মাখতুম* (বা মোহরাঙ্কিত জান্নাতি সুধা)—সিরাতুন্নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়ক অন্যতম বহুলপঠিত ও বহুল অনূদিত একটি গ্রন্থ। পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় এটি অনূদিত হয়ে সুনাম কুড়িয়েছে। বাংলা ভাষাতেও এর অনেকগুলো অনুবাদ বাজারে বিদ্যমান। ফলে এ গ্রন্থ নতুন করে অনুবাদ করার প্রয়োজন রয়েছে কি না—সে প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই সামনে আসে।

তবে গভীর পাঠ ও গবেষণার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা উপলব্ধি করেছি, নবিজির জীবনের সারনির্যাস নিয়ে রচিত এই গ্রন্থটির ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা সত্ত্বেও এর অনেক বর্ণনা ও তথ্যের প্রামাণ্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরাও গ্রন্থটির কিছু সমালোচনা করেছেন। লেখক নিজে যদিও পরবর্তী সময়ে এতে অনেক সংশোধনী এনেছেন, তথাপি গ্রন্থে অনেক ভুলভ্রান্তি রয়ে গেছে, যেগুলো নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতে স্থান পাওয়া অনুচিত।

এই প্রেক্ষাপটে শাইখ আবু আবদির রহমান মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মাল্লাহ *আত তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম* নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাহকিকগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৪৩১ হিজরি মোতাবেক ২০১০ সালে, মিশরের ইস্কান্দারিয়্যার দারুল আলামিয়্যা প্রকাশনী থেকে। এরপর ১৪৩৮ হিজরি মোতাবেক ২০১৭ সালে সৌদির দারুত তাদমুরিয়্যা প্রকাশনী থেকে এর নতুন আরেকটি সংস্করণ বের হয়। সেই গ্রন্থে তিনি *আর রাহিকুল মাখতুম*-এর ওপর মূলত নিম্নোক্ত কাজগুলো করেন—

ক. শুরুতে *আর রাহিকুল মাখতুম*-এর যে সংস্করণগুলো বের হয়েছিল, সেগুলোতে অনেক ভুল ছিল। এই গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নিজেও সেই কথাটি বলেছেন। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৯৯ হিজরি মোতাবেক ১৯৭৯ সালে। বের হওয়া মাত্রই এর প্রথম মুদ্রণের দশ হাজার কপি হাতে হাতে নিঃশেষ হয়ে যায়। পরে

লেখকের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৪[৫] সালে 'দারুল ওফা' থেকে এর পরিমার্জিত সংস্করণ বের হয়। সেই সংস্করণে তিনি কিছু সংযোজন ও বিয়োজন করেন। টীকায় পরবর্তীদের লিখিত গ্রন্থের পরিবর্তে পূর্ববর্তীদের লিখিত গ্রহণযোগ্য উৎসগ্রন্থ ও হাদিসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দেন। কিছু জায়গায় বিন্যাসে পরিবর্তন আনেন। তথ্যগত কোনো ভুল থাকলে সেটা ঠিক করেন।[৬] যেমন পুরাতন সংস্করণে 'দারুন নাদওয়ায় কুরাইশ নেতাদের এক গোপন বৈঠক' শিরোনামে নজর ইবনুল হারিস সম্পর্কে বলা হয়েছিল, 'এ হলো সেই ব্যক্তি যে নবিজির ওপর নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপ করত'—এই তথ্যটি ভুল ছিল। তাই নতুন সংস্করণে লেখক সেটা বাদ দিয়েছেন। কারণ সঠিক তথ্য হলো, বুখারি ও মুসলিমের রিওয়ায়াত অনুযায়ী নবিজির ওপর নাড়িভুঁড়ি নিক্ষেপকারী সেই ব্যক্তিটি ছিল উকবা ইবনু আবি মুআইত (عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ)।

পুরো বইয়ে তিনি কী কী পরিবর্তন ও সংশোধনী এনেছেন, প্রতিটা ধরে ধরে শাইখ মাহমুদ আল-মাল্লাহ দেখিয়েছেন এবং সেগুলোর শুদ্ধতা যাচাই করেছেন।

এই কাজটি করতে গিয়ে শুরুতেই উনি যেই কথাটি বলেছেন, তা হুবহু আমরা এখানে তুলে ধরছি,

توجد بعض الأخطاء في الطبعة القديمة للرحيق المختوم وقد عدلها المؤلف- رحمه الله- في الطبعة الجديدة سأذكرها هنا مع توضيح التعديل حتى لا ينسب للمؤلف ما تراجع عنه بنفسه وحتى يعدلها القراء الذين لديهم الطبعات القديمة وسأقتصر في التعليق هنا - غالباً- على كلام المؤلف.

আর রাহিকুল মাখতুমের পুরনো সংস্করণে[৭] কিছু ভুল ছিল। লেখক (রাহিমাহুল্লাহ) তা নতুন সংস্করণে[৮] সংশোধন করেছেন। আমি এখানে সেসব উল্লেখ করব এবং সংশোধনের ব্যাখ্যাও দেব, যাতে লেখকের নিজের সংশোধিত মতামতের পরও তাঁর প্রতি সেই পুরনো ভুলগুলো আর আরোপিত না হয়। একই সঙ্গে যাদের কাছে পুরনো

[৫] দারুল ওফা সংস্করণে লেখকের ভূমিকার নিচে এই সালটি (১৮ই রবিউল আউয়াল ১৪১৫ হিজরি মোতাবেক ২৬শে আগস্ট ১৯৯৪ খ্রি.) উল্লেখ করা।

[৬] বাংলা ভাষায় যে অনুবাদগুলো হয়েছে, এর সিংহভাগই পুরাতন সংস্করণের।

[৭] পুরনো সংস্করণের ক্ষেত্রে আমি 'দারুল ওফা' কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ এবং কায়রোর দারুল হাদিস থেকে প্রকাশিত ১৪১১ হিজরি/১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের সংস্করণের উপর নির্ভর করেছি।

[৮] নতুন সংস্করণের ক্ষেত্রে আমি 'দারুল ওফা' এবং 'দারু ইবনিল জাওজি', দাম্মাম কর্তৃক প্রকাশিত ১৪৩৪ হিজরি/২০১২-২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের সংস্করণের উপর নির্ভর করেছি।

সংস্করণ রয়েছে তারা যেন তা সংশোধন করে নিতে পারেন। এখানে আমার মন্তব্য সাধারণত লেখকের বক্তব্যের উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে।[৯]

খ. বর্ণিত হাদিসগুলোর মান যাচাই করেছেন এবং সেসব শব্দ ও বাক্যও চিহ্নিত করেছেন, যেগুলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিদের প্রসঙ্গে ব্যবহার করা সমীচীন নয়। উদাহরণস্বরূপ ১৪৭ নং টীকাটি আপনারা পড়ে দেখতে পারেন।

গ. গ্রন্থে বর্ণিত এমন অনেক ঘটনা আছে, যেগুলো সিরাত ও মাগাজির গ্রন্থগুলোতে খুব মাশহুর বা প্রসিদ্ধ হলেও সহিহ না। যেমন বিখ্যাত সাহাবি হামজা ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমার ইসলাম গ্রহণের পিছনের ঘটনা। তারপর হিজরতের সময় নবিজি ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর গুহার ভেতরের ঘটনা। এমন আরও অনেক ঘটনা। ভুল ও অগ্রহণযোগ্য সেসব ঘটনাবলি তিনি তুলে ধরেছেন।

ঘ. তাহকিকে একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। এই ক্ষেত্রে হাফেজ ইবনু হাজার, ইমাম জাহাবি, আল্লামা ইবনু কাসিরের মতো পূর্ববর্তী অনেক ইমাম ও সিরাত গবেষকের বক্তব্য তুলে ধরার পাশাপাশি পরবর্তীদের মধ্যে শাইখ আলবানি, ড. আকরাম জিয়া আল উমারি, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ আল আওশান প্রমুখের বক্তব্য যথাসম্ভব তুলে ধরেছেন।

মূল গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা মাহমুদ আল-মাল্লাহর সেই তাহকিকি গ্রন্থটিকে সামনে রেখেছি এবং সেখান থেকে তাহকিকগুলো তুলে ধরেছি। যদিও সেই গ্রন্থে তাহকিকি আলোচনা দীর্ঘ ও বিস্তারিত, পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্য ও বইয়ের কলেবর বিবেচনায় আমরা অনেক ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্তভাবে কেবল রায়টুকু উপস্থাপন করেছি। তবে প্রয়োজনে কোথাও কোথাও রিওয়ায়াতের দুর্বলতার পেছনের সুস্পষ্ট কারণও উল্লেখ করেছি।

বিভিন্ন স্থানের নামের সঠিক উচ্চারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা আতিক ইবনু গাইসের *মুজামুল মাআলিমিল জুগরাফিয়্যাহ ফিস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ* গ্রন্থটি সামনে রেখেছি।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা 'দারুল ওফা' থেকে ১৪৩১ হিজরি মোতাবেক ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত একুশতম সংস্করণ এবং 'দারু ইবনিল জাওযি' থেকে ১৪৪৪ হিজরি মোতাবেক ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সংস্করণটির উপর নির্ভর করেছি। দারুল ওফার এই নুসখাটি লেখকের অনুমোদিত ও তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত।

[৯] দেখুন 'আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম', পৃষ্ঠা নং ৩৭, দারুত তাদমুরিয়্যাহ সংস্করণ, সৌদি আরব।

সংস্করণের শেষে লেখকের একটি অনুমোদনপত্রও ছাপা আছে। স্থান, নাম ও ব্যাকরণে শুদ্ধতা, হরকতের নির্ভুল প্রয়োগ—এসব কারণে 'দারুল ওফা ও দারু ইবনিল জাওযি সংস্করণ' আমাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে।

এই প্রকল্পটির সূচনা একান্তভাবেই পথিক প্রকাশন-এর কর্ণধার ইসমাইল ভাই-এর আগ্রহ, উদ্যোগ ও পীড়াপীড়ির ফল। শুরুতে আমি নিজেও দ্বিধায় ছিলাম—বাজারে এত অনুবাদের ভিড়ে আরেকটি অনুবাদ যুক্ত করার যৌক্তিকতা নিয়ে। তবে তাহকিকভিত্তিক একটি নির্ভরযোগ্য সংস্করণ পাঠকের সামনে আনার প্রয়োজনীয়তা তিনিই প্রথম উপলব্ধি করান। অবশেষে তার সেই আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়েই আমি কাজের সূচনা করি। দীর্ঘ নয় মাস পর আল্লাহর তাওফিকে অবশেষে কাজটি আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। জানি না মানের দিক থেকে কতটুকু উত্তীর্ণ হতে পেরেছি; সেই বিচারের ভার না হয় পাঠকের হাতেই থাকল। আমাদের এই প্রচেষ্টা যদি উম্মাহর জন্য একটি সহিহ ও নির্ভরযোগ্য সিরাতচর্চার পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে, তবে আমরা নিজেদের কৃতজ্ঞ ভাবব।

যায়েদ আলতাফ
মোহাম্মদি হাউজিং সোসাইটি, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
পহেলা সফর ১৪৪৭ হিজরি মোতাবেক ২৬ আগস্ট ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

সিরাত ও ইতিহাসগ্রন্থে দুর্বল বর্ণনা : গ্রহণ-বর্জনের নীতিমালা ও দিক-নির্দেশনা

যায়েদ আলতাফ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও ইসলামি ইতিহাস অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বর্ণনাগুলোর প্রামাণ্যতা নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর বিষয়। বহু স্থানে দুর্বল বা জাল বর্ণনা এমনভাবে সিরাত ও সাহিত্যে স্থান পেয়েছে যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার সত্য-মিথ্যা যাচাই করা কঠিন। পক্ষান্তরে, সব ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর হাদিসশাস্ত্রের কঠোর মানদণ্ড প্রয়োগ করাও অযৌক্তিক, কারণ ইতিহাস ও হাদিস—এই দুই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য, চরিত্র ও সংরক্ষণ পদ্ধতিতে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

তাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি—যাতে অতীতের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক যোগাযোগ বজায় থাকে, আবার বিকৃত ইতিহাসের ফাঁদ থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান আলোচনায় ড. আকরাম জিয়া আল উমারি ও শাইখ মাহমুদ আল-মাল্লাহর মতামতের আলোকে ঐতিহাসিক বর্ণনা যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সিরাত ও ইতিহাসচর্চার পথপ্রদর্শক হতে পারে।

ডক্টর আকরাম জিয়া আল উমারি ঐতিহাসিক বর্ণনা গ্রহণ করার ব্যাপারে বলেন, হাদিস গ্রহণে যে কঠোর শর্তগুলো রয়েছে তা ঐতিহাসিক বর্ণনার ওপর প্রয়োগ করা অতি বাড়াবাড়ি ও কঠোরতাসূচক একটি রীতি; বিশেষ করে যেসব বর্ণনা সরাসরি আকিদা ও শরিয়তের বিধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। কারণ আমাদের পূর্বেকার ঐতিহাসিকরা ইতিহাস বর্ণনায় হাদিসের মতো কঠোর মানদণ্ড অনুসরণ করেননি; বরং ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁরা তুলনামূলকভাবে শিথিলতা অবলম্বন করেছেন। সুতরাং যদি আমরা তাদের এই পদ্ধতি পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে আমাদের ইতিহাসের বহু অংশ অনির্ভরযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে, যা আমাদের অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে দেবে এবং এর ফলে বিভ্রান্তি ও বিচ্ছিন্নতা দেখা

দেবে। এই বিচ্ছিন্নতা ইতিহাসচর্চাকে যেমন সংকটের মুখে ফেলবে, তেমনি মুসলিম-মানসে বিভ্রান্তি, দিকহারা ভাব ও আত্মপরিচয়হীনতার জন্ম দেবে।

তবে এই যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এটাও বলা যায় না যে, ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে হাদিসশাস্ত্রের মূলনীতি ও মাপকাঠি একেবারে পরিত্যাজ্য। কারণ ওই পদ্ধতিই আমাদের সাহায্য করে বিরোধপূর্ণ বর্ণনাগুলোর মাঝে প্রাধান্য নিরূপণ করতে এবং কোনো বক্তব্য স্বভাববিরুদ্ধ বা ইতিহাসের স্বাভাবিক ধারা ও গ্রহণযোগ্য চরিত্রবিচ্যুত কি না তা যাচাই করতে। তবে এসব বর্ণনা থেকে উপকৃত হতে হলে কিছু নমনীয়তা ও বাস্তববোধ অবলম্বন করতে হবে এবং বুঝতে হবে—হাদিস ও ইতিহাস এই দুই শাস্ত্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও সংরক্ষণ পদ্ধতিতে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সহিহ হাদিসের সংকলনে যেভাবে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, তা ইতিহাসের ক্ষেত্রে সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না।[১০]

মাহমুদ আল-মাল্লাহ বলেন, সিরাতে দুর্বল বর্ণনাগুলো উল্লেখ করার কোনো সমস্যা নেই যদি তা—

- আকিদার বিষয় বা শরিয়তের বিধান-সংক্রান্ত না হয়,
- বা কোনো কাজ বা বক্তব্যের সঠিকতা প্রমাণ করার জন্য ব্যবহৃত না হয়,
- বা নবুওয়াত ও রিসালাতের শানের খেলাফ না হয়,
- বা কোনো সাহাবির প্রতি অবমাননামূলক না হয়,
- বা বিদআত কিংবা নবোদ্ভাবিত বিষয়ের প্রসারমূলক না হয়।
- বা কোনো ভ্রান্ত মতাদর্শের সমর্থনে ব্যবহৃত না হয়।

আর দুর্বল বর্ণনা উল্লেখ করার সময় দুর্বলতা তুলে ধরাই শ্রেয়, কারণ বাস্তবে দেখা গেছে, বহু জাল ও মনগড়া কাহিনি সিরাতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মানুষের মাঝে এত ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে, সেগুলোর খণ্ডন সাধারণ মানুষের কাছে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে প্রধান কারণ হলো, ওইসব গল্পের ব্যাপক প্রসার ও বিকল্প বিশুদ্ধ তথ্যের অভাব।

সিরাত অধ্যয়নকারীদের উচিত এই প্রভেদ স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যে, নবিজির দিকে সম্পৃক্ত করে যে কথাটি বলা হচ্ছে সেটা দুর্বল হতে পারে, তবে তা বর্ণিত ঘটনাটির একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকাকে নাকচ করে না। অর্থাৎ এমনও হতে পারে, বর্ণিত ঘটনাটি সহিহ, কিন্তু সেই ঘটনায় নবিজির দিকে সম্পৃক্ত করে যে কথাটি বলা হয়েছে সেটি সহিহ না। এ পার্থক্যটা নিরূপণ করতে পারতে হবে।[১১]

---

[১০] দিরাসাতুন তারিখিয়্যাহ, পৃষ্ঠা নং ২৭।

[১১] আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম, দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, পৃষ্ঠা নং ১২-১৩।

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও গোত্রসমূহ

সিরাতুন্নবি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সর্বশেষ নবি ও রাসুলের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। মানবসমাজের কাছে তিনি যে রিসালাত তার কথা ও কাজের মাধ্যমে, দিক-নির্দেশনা ও আচরণের মাধ্যমে তুলে ধরেছিলেন এবং যার মাধ্যমে তিনি তাদের ভ্রষ্টতার গাঢ় অন্ধকার থেকে কুরআনের শাশ্বত আলোর পথে এবং বান্দাদের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বে প্রবেশ করিয়েছিলেন, এমনকি ইতিহাসের ধারা এবং মানবসমাজের জীবনযাত্রার গতিপ্রবাহকে পালটে দিয়েছিলেন—মূলত সেই রিসালাতেরই বাস্তব রূপায়ণ হলো সিরাতুন্নবি তথা রাসুলের জীবনালেখ্য। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাত গভীর ও বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

তবে সিরাতুন্নবির পূর্ণ রূপ বুঝতে হলে শুধু তাঁর জীবনের ঘটনা নয়, বরং ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাস ও পরিবেশ পরিস্থিতি কেমন ছিল এবং পরবর্তী সময়ে আল্লাহর রাসুল এতে কী বিশাল পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, উভয়ের মধ্যে আমাদের তুলনা করে দেখতে হবে। তাই মূল বিষয়ের আলোচনা শুরুর আগে ইসলামপূর্ব আরবের বিভিন্ন জাতি ও তাদের ক্রমবিকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পাশাপাশি সেই সময়ের শাসন, সাম্রাজ্য ও গোত্রব্যবস্থা এবং প্রচলিত ধর্ম, জাতি, বিশ্বাস ও মতবাদ, রীতিনীতি, ঐতিহ্য, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

এই প্রত্যেকটি বিষয় এই অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখন তা তুলে ধরা হচ্ছে।

আরবের ভৌগোলিক অবস্থান

আরব শব্দের আভিধানিক অর্থ—সাহারা, ধূসর মরুভূমি বা অনুর্বর জমি। প্রাচীনকাল থেকেই 'আরব' শব্দটি আরব উপদ্বীপ এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটি একটি বিশাল মরু অঞ্চল, যার চারদিকে বালুর ঢেউ, রৌদ্রের তীব্র উত্তাপ ও অসীম শূন্যতা ছাড়া আরি কিছুই দেখা

যায় না। যত দূর চোখ যায় শুধু খাঁ খাঁ মরুভূমি, যেখানে জীবনের তেমন কোনো চিহ্ন নেই। নেই কোনো নদী, সবুজ বনাঞ্চল কিংবা ছায়াঘেরা সুনিবিড় গ্রাম। তবে এই মরুপ্রান্তরের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আরব উপদ্বীপকে তার স্বকীয়তা দিয়েছে।

দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত এই আরব উপদ্বীপটি হচ্ছে একটি বিশাল ভূখণ্ড, যেখানে বিশাল মরুভূমি, মরূদ্যান, পাহাড় ও সমুদ্রের সংমিশ্রণ রয়েছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক এর কোন দিকে কী রয়েছে—

১. **পশ্চিম**: আরব উপদ্বীপের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত লোহিত সাগর (Red Sea) এবং সিনাই উপদ্বীপ, যা মিশরের অংশ।

২. **পূর্ব**: পূর্ব দিকে রয়েছে আরব উপসাগর (Persian Gulf)।

৩. **দক্ষিণ:** দক্ষিণে রয়েছে আরব সাগর—যার বিস্তৃতি ভারত মহাসাগর পর্যন্ত।

৪. **উত্তর:** উত্তর সীমান্তে রয়েছে বৃহত্তর শাম ও ইরাকের কিছু অংশ। উল্লিখিত সীমাগুলোর মধ্যে কিছু অমীমাংসিত সীমানাও রয়েছে, যেগুলো নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধও রয়েছে। পুরো ভূখণ্ডের আয়তন প্রায় ১০ থেকে ১৩ লক্ষ বর্গমাইল।

আরব উপদ্বীপ ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় একটি এলাকা। ভেতরে এটি বিশাল বিশাল মরুভূমি ও বালুকাময় প্রান্তর দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা এটিকে প্রাকৃতিক সুরক্ষার শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করেছে। এই প্রতিরক্ষামূলক কাঠামোর জন্য তারা বহিরাগত আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং তাদের স্বাধীনতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীনকাল থেকেই আরবরা স্বাধীন জীবনযাপন করত এবং আত্মনির্ভর ছিল। অথচ তারা ছিল তৎকালীন বিশাল দুটি সাম্রাজ্যের প্রতিবেশী। তা সত্ত্বেও এই প্রাকৃতিক সুরক্ষাই তাদের জন্য বর্ম হিসেবে কাজ করেছে। যদি এমন সুরক্ষা না থাকত, তাহলে তারা শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলোর আক্রমণ ঠ্যাকানোর ক্ষমতা রাখত না।

আর বাহ্যিক দিক থেকে আরব উপদ্বীপের অবস্থান ছিল প্রাচীন বিশ্বের তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থলে। স্থল ও জলপথ উভয়ের মাধ্যমেই এটি আফ্রিকা, ইউরোপ এবং এশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিল। এর উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল আফ্রিকার প্রবেশদ্বার, উত্তর-পূর্ব সীমান্তে ইউরোপের। আবার পূর্ব দিক দিয়ে ইরান, মধ্যপ্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। এর মাধ্যমে সুদূর হিন্দুস্তান ও চীনেও যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ ছিল।

এ ছাড়া, পৃথিবীর সকল মহাদেশই জলপথে আরব উপদ্বীপের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। এর ফলে, আরবের সমুদ্রবন্দরে বিভিন্ন মহাদেশের জাহাজ সরাসরি নোঙর করতে পারত। এমন ভৌগোলিক অবস্থানের ফলেই আরবের উত্তর ও দক্ষিণ অংশটি হয়ে উঠেছিল জাতি, ব্যবসা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও শিল্পের এক মিলনস্থল।

আরবের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী

ঐতিহাসিকদের মতে, বংশসূত্র অনুসারে আরবজাতি প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত। এই তিনটি ভাগের মধ্যে আল আরাবুল বাইদা, আল আরাবুল আরিবা এবং আল আরাবুল মুস্তারিবা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এক. আল আরাবুল বাইদা—এরা প্রাচীন আরব জাতি, যাদের সম্পর্কে ইতিহাসে খুব বেশি তথ্য পাওয়া যায় না। প্রাচীন আরবের মধ্যে আদ, সামুদ, তাসাম, জাদিস, ইমলাক, উমাইম, জুরহুম, হাদুর, ওবার, আবিল, জাসিম, হাজরামাউত প্রভৃতি জাতির নাম উল্লেখযোগ্য।

দুই. আল আরাবুল আরিবা—এরা ইয়াশজুব ইবনু ইয়ারুব ইবনি কাহতানের বংশধর এবং এদের কাহতানি আরব বলা হয়।

তিন. আল আরাবুল মুস্তারিবা—এরা ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশধর এবং এদের আদনানি আরব বলা হয়।

আল আরাবুল আরিবা

আল আরাবুল আরিবা বা কাহতানি আরবরা প্রথমে ইয়েমেনে বসবাস শুরু করে। তাদের গোত্র ও উপগোত্রগুলো সাবা ইবনু ইয়াশজুব ইবনি ইয়ারুব ইবনি কাহতানের সন্তানসন্ততিদের মধ্য থেকে গড়ে উঠেছে। তাদের মধ্যে দুটি গোত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। যথা, হিমইয়ার ইবনু সাবা ও কাহলান ইবনু সাবা। অন্যদিকে বনু সাবার অন্যান্য বংশধর যারা ১১ বা ১৪ টি উপগোত্রে বিভক্ত ছিল, তাদের 'সাবাইয়্যুন' বলা হয়। তবে সাবার বাইরে তাদের কোনো স্বাধীন গোত্র নেই।

ক. হিমইয়ার থেকে উৎপন্ন বিখ্যাত উপগোত্রগুলো হলো:

১. কুজাআ: এর অধীনে ছিল বাহরা, বিলিইয়ুন, কইন, কালব, উজরাহ ও ওয়াবারাহ।

২. সাকাসিক: তারা যায়েদ ইবনু ওয়ায়িলা ইবনি হিমইয়ারের বংশধর। যায়দের উপাধি ছিল 'সাকাসিক', যা সামনেই আলোচনায় আসা বনু কাহলানের 'সাকাসিক কিন্দাহ' থেকে আলাদা।

৩. জাইদুল জামহুর: এর অধীনে হিমইয়ার আসগর, সাবা আসগর, হাদুর এবং জুআসবাহর বংশধররা অন্তর্ভুক্ত।

খ. কাহলান থেকে উৎপন্ন বিখ্যাত উপগোত্রগুলো হলো:

১. হামদান, ২. আলহান, ৩. আশআর, ৪. তায়ি, ৫. মাজহিজ, এর থেকে আবার উৎপন্ন হয় আনস এবং নাখ, ৬. লাখম। এর একটি শাখা হলো কিন্দাহ। কিন্দাহ থেকে আবার উৎপন্ন হয়েছে বনু মুআবিয়া, সাকুন এবং সাকাসিক। এই সাকাসিক কিন্দাহ উল্লিখিত সাকাসিক থেকে আলাদা, ৭. জুজাম, ৮. আমিলা, ৯. খওলান, ১০. মাআফির, ১১. আনমার। এর অধীনে আছে খসআম ও বাজিলা। বাজিলা থেকে এসেছে আবার আহমাস। ১১. আজদ। এর অধীনে আছে আউস, খাজরাজ, খুজাআ এবং জাফনার সন্তানরা, যারা শামের রাজন্যবর্গ এবং গাসসান পরিবার নামে পরিচিত।

বনু কাহলানের লোকেরা ইয়েমেন থেকে হিজরত করে জাজিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপে আসে এবং তারা ক্রমে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

কুরআনে উল্লেখিত 'সাইলুল আরিম'[১২] (প্রবল বন্যা) ঘটনার সময় ইয়েমেনের ব্যবসা-বাণিজ্যে মারাত্মক ধস নামে। এই সময়েই কাহলানিদের অধিকাংশের হিজরত বা দেশত্যাগ ঘটে। সেই সময় রোমকরা প্রথমে মিশর ও সিরিয়ায় আগ্রাসন চালায় এবং পরে ইয়েমেনের দিকে কুনজর দেয়। এরপর তারা তাদের জল ও স্থলপথের সমস্ত বাণিজ্যিক রুটগুলো দখল করে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, ইয়েমেনের পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত সংকটময় ছিল, যার ফলস্বরূপ কাহলান গোত্রের লোকেরা হিজরত করে।

আবার দেশত্যাগের কারণ এটাও হতে পারে, কাহলান ও হিমইয়ার গোত্রের মধ্যে বিবাদবিসংবাদ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কাহলানিরা ইয়েমেন ছাড়তে বাধ্য হয়। কেননা কাহলানিরা দেশত্যাগ করলেও হিমইয়ারিরা সেখানে থেকে যায় এবং হিমইয়ারিদের সেখানে টিকে থাকা এমনই ইঙ্গিত বহন করে।

দেশ ত্যাগ করা কাহলান গোত্রের এই মুহাজিরদের চারটি প্রধান দলে বিভক্ত করা যেতে পারে:

১. **আল আজদ:** আজদিরা তাদের গোত্রপতি ইমরান ইবনু আমর মুজাইকিয়ার সিদ্ধান্তে হিজরত করে। শুরুতে তারা ইয়েমেনের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং বসবাসের উপযোগী ভূমির সন্ধানে দিগ্‌বিদিক

[১২] সুরা সাবা—১৫-১৯

দূত পাঠায়। পরবর্তী সময়ে তারা উত্তর ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। নিম্নে তাদের বিভিন্ন দল ও তাদের বসবাসের স্থানের বর্ণনা তুলে ধরা হলো—

ক. ইমরান ইবনু আমর তার সন্তানসন্ততিদের নিয়ে ওমানে চলে যান এবং সেখানে তাদের নতুন বসতি স্থাপন করেন। তাদের 'আজদু উমান' বলা হয়।

খ. নাসর ইবনু আজদ এবং তার অনুসারীরা তুহামা[১৩] অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন এবং তাদের 'আজদু শানুআ' বলা হয়।

গ. আজদ গোত্রের সালাবা ইবনু আমর প্রথমে হিজাজ সফর করেন। সেখান থেকে তিনি সালাবিয়্যা ও জু-কারের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান নেন। পরে তার সন্তানসন্ততি প্রাপ্তবয়স্ক ও শক্ত-সমর্থ হলে এবং তার বংশধররা শক্তিশালী হয়ে উঠলে তিনি মদিনায় চলে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মদিনার বিখ্যাত আউস ও খাজরাজ ছিল এই সালাবারই উত্তরসূরি। তারা ছিল সালাবার পুত্র হারিসার সন্তান।

ঘ. হারেসা ইবনু আমর ও তার খুজাআ গোত্রের সদস্যরা প্রথমে হিজাজের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরতে থাকেন, এরপর একসময় তারা মাররুজ জাহরান[১৪] নামক স্থানে আস্তানা গাড়েন। এরপর তারা হারাম এলাকা দখল করে সেখানকার বাসিন্দা বনু জুরহুমকে বিতাড়িত করে মক্কাতে বসতি গড়ে তোলেন।

ঙ. জাফনা ইবনু আমর শামের দিকে চলে যান এবং সেখানে তিনি ও তার সন্তানরা বসতি স্থাপন করেন। তিনি গাসসানি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত। সিরিয়া যাওয়ার আগে, হিজাজে তারা গাসসান নামক একটি জলাশয়ের কাছে অবস্থান করেছিল। এরপর তারা গাসসানি নামে পরিচিত হয়।

চ. ছোট ছোট অনেক গোত্র এই গাসসানি গোত্রের সঙ্গে হিজাজ ও শামের অভিবাসনে যুক্ত হয়েছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, কাবু ইবনু আমর, হারিস ইবনু আমর এবং আউফ ইবনু আমর।

---

[১৩] تُهامَة. أَزْدُ شَنُوْءَة

[১৪] বর্তমান নাম ওয়াদিয়ে ফাতিমা। এই উপত্যকাটি মক্কার উত্তরে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ২১০ কিলোমিটার।

২. **লাখম ও জুজাম**: তারা পূর্ব ও উত্তর দিকে চলে গিয়েছিল। লাখমিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন নাসর ইবনু রবিআ, যিনি হিরায় রাজ্য শাসক মুনজির রাজবংশের প্রথম পুরুষ।

৩. **বনু 'তাঈ'**:[১৫] আজদ গোত্র চলে যাওয়ার পর, 'তাঈ' গোত্রের লোকেরা উত্তরাঞ্চলে সফর শুরু করে। তারা আজা ও সালমা নামক পাহাড়ে অবতরণ করে, এবং পরবর্তী সময়ে পাহাড় দুটি 'তাঈ' পাহাড় নামে পরিচিতি লাভ করে।

৪. **কিন্দাহ**: কিন্দাহবাসীরা বাহরাইন অঞ্চলে প্রথমে বসতি গড়ে তোলে, তবে সেখানকার পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় তারা বাহরাইন ছেড়ে 'হাজরামাউত' চলে যেতে বাধ্য হয়। সেখানেও বিপদে পড়ে তারা শেষ পর্যন্ত 'নাজদ' অঞ্চলে চলে আসে, যেখানে তারা জাঁকজমকপূর্ণ শক্তিশালী এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অল্প কিছুদিন পর তাদের সেই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

এ ছাড়া, 'কুজাআ' নামে হিমইয়ার গোত্রের একটি শাখার কথা শোনা যায়। অবশ্য, এরা হিমইয়ারের শাখা কিনা এ নিয়ে মতভেদ আছে। এরা ইয়েমেন থেকে হিজরত করে ইরাক সীমানায় 'বাদিয়াতুস সামাওয়াত' নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। এ ছাড়াও হিমইয়ারের আরও কিছু শাখা সিরিয়া ও হিজাজ থেকে উত্তর দক্ষিণ দিকে ছড়িয়ে পড়ে।[১৬]

আল-আরাবুল মুস্তারিবা

এই সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষ ইবরাহিম আলাইহিস সালাম। জন্মসূত্রে তিনি ইরাকি ছিলেন। ইরাকের কুফা শহরের অদূরে ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত 'উর' নামক এলাকায় তার জন্ম। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের পরিবার, শহর এবং

---

[১৫] بَنُو طَيِّء

[১৬] সকল গোত্র ও তাদের দেশত্যাগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন—নাসাবু মাআদ ওয়াল ইয়ামানুল কাবির, জামহারাতুন নাসাব, আল-ইকদুল ফারিদ, কলাইদুল জিমান, নিহায়াতুল আরব, তারিখে ইবনু খালদুন, সাবাইকুয জাহাব ফি মারিফাতি কবা-ইলিল আরব এবং বংশধারাবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রাক ইসলামি যুগের আরবের ওপর লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ইতিহাসের উৎসগ্রন্থগুলোতে এ সকল হিজরতের সময় ও কারণ নিয়ে বেশ মতপার্থক্য লক্ষ করা যায়। আমরা সেটিই এখানে তুলে ধরেছি, সার্বিক তথ্য-উপাত্ত ও দলিল-প্রমাণ বিশ্লেষণের পর যেটি আমাদের কাছে অগ্রগণ্য মনে হয়েছে।

সেখানে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতি নিয়ে সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়েছে, যা নতুন তথ্য উন্মোচন করেছে।

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম প্রথমে 'হারান' কিংবা 'হাররান' নামক স্থানে হিজরত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ফিলিস্তিনে চলে যান এবং ফিলিস্তিনকে কেন্দ্র করেই তার দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এরপর তিনি দাওয়াত নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছোটাছুটি করেন। ঘটনার পরিক্রমায় একবার তিনি এমন এক জনপদে (মিশরে) প্রবেশ করেন যেখানে এক অত্যাচারী শাসক ছিল। সে সময় তার সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী সারা। তিনি ছিলেন পরমা সুন্দরী। অত্যাচারী শাসক সংবাদ পেয়ে তার স্ত্রী সারাকে বন্দি করে এবং অসদুদ্দেশ্যে তার দিকে হাত বাড়ায়। তখন সারা তার বিরুদ্ধে সাহায্য চেয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেন। আল্লাহ তাআলার কুদরতে তখন তার অপকৌশল বুমেরাং হয়ে তার দিকেই ঘুরে যায়। সে তখন বুঝতে পারে যে, সারা আলাইহাস সালাম আল্লাহ তাআলার অত্যন্ত মর্যাদাশীল নেককার একজন বান্দি। এরপর সে সারার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি কিংবা আল্লাহর আজাবের ভয়স্বরূপ হাজেরাকে[১৭] তার খাদেমা হিসেবে দান করে দেয়। পরবর্তী সময়ে সারা ইবরাহিম আলাইহিস সালামের জন্য হাজেরাকে দান করে দেন।[১৮]

এসব ঘটনার পর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার দাওয়াতের মূল কেন্দ্র ফিলিস্তিনে ফিরে আসেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে হাজেরার গর্ভ থেকে তার পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে দান করেন। কিন্তু সারা নিজে নিঃসন্তান হওয়ায় হাজেরার প্রতি কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। এমনকি হাজেরাকে তার ছোট্ট দুধের বাচ্চাসহ দেশান্তর করতে ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে বাধ্য করেন। ইবরাহিম আলাইহিস

---

[১৭] জানা যায় যে, ওই অত্যাচারী ব্যক্তিটি ছিল মিসরের এক ফেরাউন। আর হাজেরা ছিলেন তার একজন দাসী। তবে বিখ্যাত সিরাত গবেষক কাজি সুলাইমান মানসুরপুরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, তিনি দাসী ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন ফেরাউনের কন্যা এবং মুক্ত ও স্বাধীন। তিনি এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কারণ আহলে কিতাব (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) পণ্ডিতগণ তাদের সহিফাসমূহের ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতে এই দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। [দেখুন রহমাতুল্লিল আলামিন—খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৬ ও ৩৭]

ইবনু খালদুন তার *মুকাদ্দিমা* নামক গ্রন্থে একটি সংলাপ উল্লেখ করেন, যা আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং মিশরের জনগণের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। মিশরীয়রা তাকে বলেছিল, 'হাজেরা আমাদের এক রাজার স্ত্রী ছিলেন। আমাদের এবং "আইনে শামস" অঞ্চলের লোকদের মধ্যে অনেকগুলো যুদ্ধ হয়েছিল। এর একটিতে তারা আধিপত্য বিস্তার করে আমাদের রাজাকে হত্যা করে এবং হাজেরা আলাইহাস সালামকে বন্দি করে। সেখান থেকে তিনি ইবরাহিম আলাইহিস সালামের হাতে পৌঁছান।' [তারিখু ইবনি খালদুন—খণ্ড: ২/১/৭৭]

[১৮] মূল ঘটনাটি বিস্তারিত জানতে দেখুন সহিহ বুখারি—হাদিস নং ২২১৭, ২৬৩৫, ৩৩৫৭, ৩৩৫৮, ৫০৮৪, ৬৯৫০।

সালাম তাদের নিয়ে হিজাজ (বর্তমান সৌদি আরব) চলে আসেন। সেখানে, বাইতুল্লাহর কাছে, একটি বিরান উপত্যকায় বসবাস করতে থাকেন। তখন বাইতুল্লাহ ছিল টিলার মতো কেবল উঁচু একটি ভূমি। পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির ঢল এই টিলার ডানবাম ঘেঁষে প্রবাহিত হতো। সে সময় মাসজিদুল হারামের পাশে উঁচু স্থানে—যেখানে জমজম কূপ, তার নিকটে একটি গাছ ছিল, তিনি তাদের দুজনকে সে গাছের নিচে এনে রাখেন।

মক্কা তখন ছিল এক শুষ্ক ও জনমানবশূন্য মরুভূমি। হাজেরা ও ইসমাইলের জন্য কেবল এক থলে খেজুর ও এক মশক পানি রেখে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আবার সেই ফিলিস্তিন ভূমিতে পাড়ি জমান। জীবনধারণের এই সামান্য খেজুর ও পানিটুকু ছাড়া হাজেরার হাতে আর কিছুই ছিল না। কিছুদিন পর, খাদ্য ও পানি ফুরিয়ে আসে এবং কঠিন দুঃসময় দেখা দেয়। সেই কঠিন দুঃসময়ে আল্লাহর রহমতের জলধারা জমজম রূপে প্রকাশ লাভ করে। যা তাদের বাঁচানোর জন্য অপরিহার্য পানি সরবরাহ করে। পরবর্তী সময়ে জমজম কূপ দীর্ঘ সময় ধরে তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিস্তারিত ঘটনা তো আমরা সবাই জানি![১৯]

এভাবে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই মা-ছেলের দিন কেটে যাচ্ছিল। কিছুকাল পরে ইয়েমেন থেকে একটি গোত্র মক্কায় আসে। তাদের 'দ্বিতীয় জুরহুম' বলা হয়। এই গোত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামের মাতা হাজেরার অনুমতি নিয়ে মক্কায় বসবাস করতে থাকে। ইতিহাসে বলা হয় যে, জুরহুম গোত্র প্রথমে মক্কার আশপাশের পর্বতময় অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। বুখারি শরিফে উল্লেখ আছে যে, তারা মক্কায় বসবাস শুরু করে ইসমাইল আলাইহিস সালামের জন্মের পর ও তার যৌবনে পদার্পণের আগে; যদিও এর আগে এই অঞ্চল দিয়ে তাদের যাতায়াত ছিল। পরে তারা স্থায়ীভাবে সেখানে বসতি স্থাপন করে।[২০]

ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার স্ত্রী হাজেরা আলাইহাস সালাম এবং পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে সময় সময় মক্কায় আসতেন। তবে তিনি ঠিক কতবার এই পুণ্যভূমিতে এসেছিলেন, তার নির্ভরযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবুও ইতিহাসবিদগণের মতে, তিনি মোট চারবার মক্কায় আগমন করেছিলেন। এই চার দফা আগমনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

---

[১৯] সহিহ বুখারি—হাদিস নং ৩৩৬৪, ৩৩৬৫।

[২০] প্রাগুক্ত—হাদিস নং ৩৩৬৪।

১. কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে স্বপ্নযোগে দেখান যে, তিনি তার পুত্র ইসমাইল আলাইহিস সালামকে কুরবানি করছেন। এটি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পরীক্ষা এবং নির্দেশ। পিতা ও পুত্র উভয়েই এই নির্দেশ পালনে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে যান। ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে:

فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ. وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ. اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ. وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ.

'উভয়ে যখন (স্বপ্নাদেশের প্রতি আনুগত্য) প্রকাশ করল এবং পিতা পুত্রকে কুরবানি করার উদ্দেশ্যে উপুড় করে শুইয়ে দিল, তখন আল্লাহ তাআলার বাণী ঘোষিত হলো, হে ইবরাহিম! তোমার স্বপ্নকে তুমি সর্বতোভাবে সত্যে পরিণত করেছ। অবশ্যই আমি সৎকর্মশীলগণকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিঃসন্দেহে এটা ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা। পরে আমি তাকে এক মহান পশুর (কুরবানির) বিনিময়ে মুক্ত করি।' [সুরা সাফফাত, আয়াত: ১০৩-১০৭]

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পুস্তক 'দ্যা বুক অফ জেনেসিস' (The Book of Genesis) অনুসারে, ইসমাইল আলাইহিস সালাম ইসহাক আলাইহিস সালামের চেয়ে ১৩ বছরের বড় ছিলেন। ঘটনাপ্রবাহ থেকে বুঝা যায়, ইসমাইল আলাইহিস সালামের কুরবানি সম্পর্কিত ঘটনা ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের আগেই ঘটেছিল। এই সময় ইসমাইল যৌবনে পদার্পণের পূর্বে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম কমপক্ষে একবার মক্কা সফর করেছিলেন। বাকি তিন সফরের বিবরণ সহিহ বুখারিতে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মারফু সূত্রে এসেছে। যার সংক্ষিপ্তসার হলো,

২. ইসমাইল আলাইহিস সালামের জীবন জুরহুম গোত্রের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল। তাদের সঙ্গেই তিনি বড় হন এবং ধীরে ধীরে তাদের থেকে আরবি ভাষা রপ্ত করেন। ইসমাইল আলাইহিস সালামের এই প্রতিভা এবং চরিত্রে তারা এতটাই মুগ্ধ হয় যে, তাদের এক কন্যাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেন। এই সময়ে তার মমতাময়ী মা হাজেরা আলাইহাস সালাম দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

বিয়ের পর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্ত্রী ও সন্তানের খোঁজ নিতে মক্কায় আসেন। ইসমাইল আলাইহিস সালাম তখন বাড়িতে ছিলেন না। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তার পুত্রবধূর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে চান। পুত্রবধূ তাদের অভাব অনটন এবং জীবনযাপনের কষ্টের কথা তুলে ধরে অভিযোগ

করেন। তখন ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলেন, 'তোমার স্বামী এলে বলবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠটি পরিবর্তন করে নেয়।'

ইসমাইল আলাইহিস সালাম ফিরে এসে পিতার এই নির্দেশের কথা শুনেই বুঝে ফেললেন এর মর্ম কী। তার পিতা দরজার চৌকাঠ পরিবর্তন করার কথা বলে আসলে তাকে তার স্ত্রী পরিবর্তনের নির্দেশ দিয়েছেন। তখন তিনি তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন। এরপর অন্য এক নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। অধিকাংশের মত অনুযায়ী তার এই স্ত্রী ছিলেন মুদাদ ইবনু আমরের কন্যা, যিনি জুরহুম গোত্রের সর্দার এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

৩. ইসমাইলের দ্বিতীয় বিয়ের পর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আবার মক্কায় আসেন এবং এবারও এসে দেখেন ইসমাইল বাড়িতে নেই। তিনি পুত্রবধূর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন। পুত্রবধূ কোনো অভিযোগ না করে আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং তাঁর নিয়ামতের শোকর আদায় করেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবার বলেন, 'তোমার স্বামী এলে বলবে, সে যেন তার দরজার চৌকাঠ স্থির রাখে।'

৪. এবার ইবরাহিম আলাইহিস সালাম যখন মক্কায় আসেন, তখন তার সঙ্গে পুত্র ইসমাইলের সাক্ষাৎ হয়। জমজম কূপের কাছে একটি বড় গাছের নিচে ইসমাইল বসে তিরে শান দিচ্ছিলেন। হঠাৎ পিতাকে দেখে তিনি এগিয়ে যান। স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভব এক আবেগঘন মুহূর্তের সৃষ্টি হয়। একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন। তাদের এই সাক্ষাৎ ছিল বহুকাল পর। এত সুদীর্ঘকাল কোনো বয়োবৃদ্ধ ও স্নেহশীল পিতার এবং পিতার একান্ত অনুগত কোনো নেক সন্তানের পক্ষে সবর করে থাকাটা সত্যিই দুষ্কর। এটা কজনই-বা থাকতে পারে! এবার এসে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে পবিত্র কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেন। দুজন মিলে এর মূল ভিত উঁচু করে দেন। তারপর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে মানুষের মাঝে হজের আহ্বান ঘোষণা করেন।[২১]

মুদাদ ইবনু আমরের কন্যার গর্ভে ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর ১২ জন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাদের নাম ছিল: ১. নাবিত কিংবা নাবায়ুত ২. কাইদার ৩. আদবাইল ৪. মিবশাম ৫. মিশমা ৬. দুমা ৭. মিশা ৮. হাদাদ ৯. তিমা ১০. ইয়াতুর ১১. নাফিস ১২. কাইদুমান।

[২১] সহিহ বুখারি, কিতাবুল আম্বিয়া—৩৩৬৪, ৩৩৬৫।

এই ১২ জন পুত্রের মাধ্যমে ১২টি গোত্রের উৎপত্তি হয়। প্রথমদিকে তারা সবাই মক্কায় বসবাস করত এবং তাদের প্রধান জীবিকা ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে প্রায়ই তারা ইয়েমেন, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করত।

কালের পরিক্রমায় এবং বিভিন্ন কারণে এই ১২টি গোত্রের অধিকাংশ বিলীন হয়ে যায় এবং কেবল দুটি গোত্র বেঁচে থাকে: ১. নাবিত ২. কাইদার।

এই দুই গোত্রের মধ্যে কাইদারের বংশধরদের মধ্যে মক্কা ও এর আশপাশের অঞ্চলে তাদের অধিক পরিচিতি ও প্রভাব ছিল, আর নাবিত গোত্রের শাখা-প্রশাখা অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হিজাজের উত্তর প্রান্তে নাবিতের উত্তরসূরিরা আনবাত সভ্যতার বিকাশ ঘটান। তারা শক্তিশালী একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, যা আশেপাশের রাজ্যগুলোকে তাদের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করে। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল প্রাচীন নিদর্শনসমৃদ্ধ 'বাতরা' বা পেত্রা, যা দক্ষিণ জর্ডানে অবস্থিত। সেই সময়ে আনবাতের ক্ষমতা এতটা বিস্তৃত ছিল যে, তাদের বিরুদ্ধে অবাধ্য হওয়ার সাধ্য কারও ছিল না।

তবে, হঠাৎ করেই রোমকরা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং তাদের ওপর আগ্রাসন চালিয়ে আনবাত সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দেয়।

বংশধারা সম্পর্কে বিজ্ঞ একদল মুহাক্কিক আলিম গভীর অনুসন্ধান ও গবেষণার পর এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তারা বলেন, গাসসানি রাজা বাদশাহ এবং আউস ও খাজরাজ গোত্রের কেউ কাহতান বংশোদ্ভূত ছিলেন না; বরং তারা ইসমাইল আলাইহিস সালামের পুত্র নাবিতের বংশধর এবং সেসব অঞ্চলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মটিই বসবাস করত।

ইমাম বুখারিও তার সহিহতে এই মতটি গ্রহণ করেছেন। তিনি সেখানে একটি পরিচ্ছেদই রেখেছেন 'ইসমাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে ইয়েমেনবাসীর সম্পর্ক' শিরোনামে। তারপর কিছু হাদিস দ্বারা এর স্বপক্ষে দলিলও দিয়েছেন। হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বুখারির ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারিতে এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, কাহতান মূলত নাবেত ইবনু ইসমাইল (আলাইহিস সালাম)-এর বংশোদ্ভূত।[২২]

---

[২২] সহিহ বুখারি—(কিতাবুল মানাকিব), ইসমাইল আলাইহিস সালামের সঙ্গে ইয়েমেনবাসীর সম্পর্ক পরিচ্ছেদ: ৩৫০৭; ফাতহুল বারি—খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা নং ৬২১-৬২৩; এ ছাড়া আরও দেখুন নাসাবু মাআদ ওয়াল ইয়ামানুল কাবির, কালবি—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১৩১; তারিখু ইবনি খালদুন—২/১/৪৬, ২/১/২৪১,২৪২।

ওদিকে কাইদার ইবনু ইসমাইলের সন্তানসন্ততি মক্কাতেই বসবাস করতে থাকে এবং সেখানেই তাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। এই বংশ থেকে আদনান এবং তার পুত্র মাআদ জন্মগ্রহণ করেন। আদনান ছিলেন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঊর্ধ্বতন একবিংশ পুরুষ। এরপর থেকে আদনানি আরবরা নিজেদের বংশপরম্পরা সংরক্ষণ করে।

বর্ণিত আছে যে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কখনো তার বংশধারা বর্ণনা করতেন, তখন তিনি আদনান পর্যন্ত এসে থেমে যেতেন এবং বলতেন,

كذب النسابون.

'এরপর বংশধারা বর্ণনাকারীরা মিথ্যা বলেছে।'[২৩]

তবে এক দল আলিম মনে করেন, আদনান থেকে আরও ওপরে নবিজির বংশধারা বর্ণনা করা যেতে পারে। তারা বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশপরম্পরা বর্ণনা করার সময় আদনান পর্যন্ত থেমে যাওয়ার যে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, তা দুর্বল।[২৪] তারা আরও বলেন, সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, আদনান ও ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মাঝে মোট ৪০ পুরুষের ব্যবধান ছিল।[২৫]

---

[২৩] তারিখে তাবারি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৭২-২৭৬।

[২৪] মাহমুদ আল-মাল্লাহ বলেন, লেখক যদিও জয়িফ বলে দিয়েছেন, আমার মতে এটি একটি জাল হাদিস। কারণ ইমাম সুয়ূতি 'আল-জামি' গ্রন্থে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন 'ইবনু সাদ এবং ইবনু আসাকিরের সূত্রে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে।' আর ইবনু সাদ তাঁর 'তাবাকাত'-এ (১/১/২৮) হাদিসটি নিম্নোক্ত সনদে উল্লেখ করেন, 'আমাদেরকে হিশাম বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু সালেহ থেকে, আর তিনি ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে, মানে সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।"

আমি বলি, এই হিশাম হচ্ছেন হিশাম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আস-সায়িব আল-কালবি, যিনি একজন বংশতত্ত্ববিদ ও তাফসিরবিদ ছিলেন। তবে তিনি পরিত্যক্ত রাবি, যেমন দারাকুতনি ও অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন। আর তাঁর পিতা মুহাম্মাদ ইবনু আস-সায়িব তো তাঁর চেয়েও অধিক দুর্বল। জাওযাজানি ও অন্যান্য ইমামগণ বলেছেন, 'তিনি একজন মিথ্যাবাদী। এমনকি তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি মিথ্যা বলেন।' [বিস্তারিত তাহকিক দেখুন আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম, পৃষ্ঠা নং ৭১-৭৪ ও ৩৩১, দারুল আলামিয়্যা সংস্করণ, ইস্কান্দার]

[২৫] তাবাকাতে কুবরা, ইবনু সাদ—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ৫৬; তারিখে তাবারি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৭২-২৭৩; মুরুজুয জাহাব, মাসউদি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৭৩, ২৭৪; তারিখু ইবনি খালদুন—২/২/২৯৮,ফাতহুল বারি—খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা নং ৬২২, রহমাতুল্লিল আলামিন—খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা নং: ৭-৮, ১৪-১৭।

আব্দুল মুত্তালিবের ছিল সর্বমোট ১০ জন পুত্রসন্তান। তাদের নাম ছিল যথাক্রমে—হারিস, যুবাইর, আবু তালিব, আবদুল্লাহ (রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা), হামজা, আবু লাহাব, গাইদাক, মুকাওবিম, দিরার ও আব্বাস। কেউ কেউ ১১ জন পুত্রের কথা বলেছেন, তাদের মতে অতিরিক্ত পুত্রের নাম কুছাম। আবার কেউ কেউ ১৩ জনের কথাও উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে, বাকি দুজনের নাম আব্দুল কাবা ও হাজলান। তবে আরেক মতে মুকাওবিমের অপর নাম আব্দুল কাবা আর হাজলান মূলত গাইদাক। ইতিহাসবিদদের মতে কুছাম নামে আব্দুল মুত্তালিবের কোনো পুত্র ছিল না।

আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিল ছয় জন। তাদের নাম—১. উম্মুল হাকিম বা বাইদা, ২. বাররা, ৩. আতিকা, ৪. সাফিয়া, ৫. আরওয়া ও ৬. উমাইমা।[১০৬]

নবিজির পিতা আবদুল্লাহ

তার মায়ের নাম ছিল ফাতিমা। যিনি ছিলেন আমর ইবনু আইজ ইবনি ইমরান ইবনি মাখজুম ইবনি ইয়াকজা ইবনি মুররার কন্যা। আবদুল্লাহ ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানগণের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তার আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল—তিনি ছিলেন একজন জাবিহ বা আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত।

তাকে জাবিহ বলার কারণ, আব্দুল মুত্তালিবের যখন দশজন পুত্রসন্তান পূর্ণ হলো এবং তিনি দেখলেন যে, তারা তাকে রক্ষা করার মতো প্রাপ্ত বয়সে উপনীত হয়েছে, তখন তিনি তাদের নিজ মানতের ব্যাপারে অবহিত করেন। সন্তানরাও তাতে সানন্দে সায় দেয়। কিন্তু কাকে কুরবানি করবেন? তখন তিনি লটারির দেন। লটারিতে আব্দুল্লাহর নাম উঠে আসে। কিন্তু আবদুল্লাহ ছিল আব্দুল মুত্তালিবের সবচেয়ে প্রিয়। তাই তিনি দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ, আমি আবদুল্লাহ ও ১০০টি উটের মাঝে লটারি দিতে চাই।' এই বলে তিনি আবার লটারি দিলেন। এবার ১০০টি উট উঠল।[১০৭]

আবার কেউ বলেন, নির্ধারণের কাজটি এভাবে হয়েছিল,আব্দুল মুত্তালিব তাদের ১০ জনের নাম ভাগ্য নির্ণায়ক তিরের গায়ে লিখে 'হুবাল' মূর্তির দায়িত্বশীলের কাছে জমা দেন। লটারি করার পর নাম উঠে এলো আব্দুল্লাহর। তখন তিনি তাকে কুরবানির

[১০৬] সিরাতু ইবনি হিশাম—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১০৮-১০৯, তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার—পৃষ্ঠা নং ৮-৯।

[১০৭] তারিখে তাবারি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৩৯।

জন্য কাবাচত্বরে নিয়ে যান। তার হাতে ছিল একটি ধারালো ছুরি। কিন্তু কুরাইশরা, বিশেষত বনু মাখজুম তথা তার মামার বংশ এবং তার ভাই আবু তালিব এ কাজের প্রতিবাদ করেন। তখন আব্দুল মুত্তালিব বলেন, 'তাহলে আমি আমার মানত কীভাবে পূরণ করব?' তখন তারা তাকে গণকের কাছে যেতে বললেন। তাদের পরামর্শে তিনি এক গণকের কাছে যান। সে আবদুল্লাহ ও ১০টি উটের মাঝে লটারি করতে বলে। লটারিতে যদি আব্দুল্লাহর নাম ওঠে, তাহলে উটের সংখ্যা ১০টি করে বৃদ্ধি করতে হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে উটের গায়ে লটারি ফেলেন। যখন উটের নাম উঠবে, তখন সবগুলো আল্লাহর নামে কুরবানি করতে হবে।

কাবার কাছে ফিরে এসে তিনি আবদুল্লাহ ও ১০ উটের মাঝে লটারি টানলেন। কিন্তু প্রতিবার আব্দুল্লাহর নামই ওঠে। আর ১০টি করে উট কুরবানির জন্য বরাদ্দ করা হয়। অবশেষে যখন উটের সংখ্যা ১০০তে পৌঁছায়, তখন লটারিতে উটের নাম ওঠে। তারপর সবগুলো জবাই করে সেগুলো মানুষ ও পশুপাখি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়ে সেখানেই ফেলে রাখা হয়।

এই ঘটনার আগে কুরাইশ ও সমগ্র আরবে দিয়াতের (প্রাণের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণের) পরিমাণ ছিল ১০টি উট। কিন্তু আব্দুল্লাহর মুক্তির এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দিয়াতের পরিমাণ ১০০ উটে উন্নীত করা হয়। পরবর্তী সময়ে ইসলামি শরিয়তও এ নিয়ম বহাল রাখে। এই ঘটনাকে স্মরণ করে নবিজি বলেছেন,

أنا ابن الذبيحين.

'আমি দুই জাবিহের উত্তরসূরি।'[১০৮]

প্রথম জাবিহ ইসমাইল আলাইহিস সালাম এবং দ্বিতীয় জাবিহ নবিজির পিতা আবদুল্লাহ।[১০৯]

আব্দুল মুত্তালিব তার পুত্র আব্দুল্লাহর জন্য বেছে নেন কুরাইশ বংশের এক সম্ভ্রান্ত নারী আমিনা বিনতু ওহাবকে। আমিনা ছিলেন ওহাব ইবনু আব্দি মানাফ ইবনি জুহরা ইবনি কিলাবের কন্যা। সে সময় বংশমর্যাদা ও সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তাকে কুরাইশের সর্বোত্তম নারী হিসেবে গণ্য করা হতো। তার পিতা বনু জুহরা গোত্রের

[১০৮] এই শব্দে এই হাদিসটির কোনো সহিহ সূত্র নেই, যেমনটি ইবনু হাজার, জায়লায়ি ও শাইখ আলবানি উল্লেখ করেছেন। দেখুন 'আস-সিলসিলাতুজ জয়িফাহ' (হাদিস নং ৩৩১) [দেখুন আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম, শাই মাহমুদ আল-মাল্লাহ, পৃষ্ঠা নং ৮৩ এবং ৩৩১]

[১০৯] সিরাতু ইবনি হিশাম—খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা নং ১৫১-১৫৫; তারিখে তাবারি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৪০-২৪৩।

সর্দার এবং মক্কার অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি। মক্কায় অত্যন্ত আনন্দ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশে আমিনা ও আব্দুল্লাহর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়।

বিবাহের কিছুদিন পর আব্দুল মুত্তালিব তার পুত্র আব্দুল্লাহকে খেজুর দেখাশোনার কাজে মদিনায় পাঠান। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আরেকটি বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়া গিয়েছিলেন। কুরাইশ কাফেলার সাথে ফেরার সময় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় মদিনায় যাত্রাবিরতি দেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

মদিনার দারুন নাবিগা আল জুদিতে তার দাফনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র ২৫ বছর। বেশিরভাগ ইতিহাসবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের আগেই ইন্তিকাল করেন। তবে অল্প কিছু বর্ণনায় রয়েছে, তিনি নবিজির জন্মের দুই মাস পরে ইন্তিকাল করেন।[১১০] তার মৃত্যুসংবাদ মক্কায় পৌঁছলে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় আমিনা একটি শোকগাথা আবৃত্তি করেছিলেন—

عَفَا جانبُ البطحاءِ من ابن هاشم**وجاور لَحْدًا خارجًا في الغَمَاغِم

دَعَتْه المنايا دعوة فأجابها**وما تركتْ في الناس مثل ابن هاشم

عشية راحوا يحملون سريره**تَعَاوَرَهُ أصحابه في التزاحم

فإن تك غالته المنايا ورَيْبَها**فقد كان مِعْطاءً كثير التراحم

‘বাতহার এই জমিন হারাল হাশিমের পুত্রকে, নশ্বর এই পৃথিবী ছেড়ে সে দূর এক কবের শায়িত হয়েছে। মৃত্যুর ডাকে সারা দিল সে; মৃত্যু তো এমনি, সে ইবনু হাশিমে মতো ব্যক্তিকেও ছাড়েনি। সেই দুঃসহ সন্ধ্যার কথা মনে হলে আজও বুক ভেঙে যায়, যখন লোকেরা নিজেদের মধ্য হাত বদল করে তাকে খাটিয়ায় করে নিয়ে যাচ্ছিল। মৃত্যু যদিও তার জীবনের ইতি টেনে দিয়েছে, কিন্তু তার কীর্তিগুলোকে কখনো মুছে ফেলতে পারবে না। তিনি ছিলেন বড়ই দানশীল ও দয়াবান।’[১১১]

মৃত্যুকালে আবদুল্লাহ যে সহায়-সম্পদ রেখে গিয়েছিলেন, তার মধ্যে ছিল ৫টি উট, একপাল মেষ এবং একজন হাবশি দাসী, যার নাম ছিল বারাকাহ, উপনাম উম্মু

[১১০] সিরাতু ইবনি হিশাম—খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা নং ১৫৬-১৫৮; তারিখে তাবারি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৪৬; আর-রওজুল উনফ—খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা নং ১৮৪।

[১১১] তাবাকাতু ইবনি সাদ—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১০০।

আইমান। এই উম্মু আইমানই নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লালনপালন করেন।[১১২] তিনি ছিলেন তার খাদেমা ও মাতৃতুল্য অভিভাবক।

নবিজির জন্ম ও নবুওয়াতপূর্ব চল্লিশ বছর

মানবজাতির মুক্তির বার্তা নিয়ে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পৃথিবীতে আগমন করেন। তিনি ৯ই রবিউল আউয়াল, সোমবার সকালে আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে বনু হাশিম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[১১৩] সে বছরই হস্তীবাহিনীর ঘটনা ঘটে এবং পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ার সিংহাসনে অভিষেকের ৪০ বছর পূর্ণ হয়। আল্লামা সুলাইমান মানসুরপুরী এবং জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশার গবেষণা অনুযায়ী এ দিনটি ছিল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২০ বা ২২শে এপ্রিল।[১১৪]

ইবনু সাদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবিজির আম্মাজান বলেন, 'আমি যখন তাকে প্রসব করি, তখন আমার দেহ থেকে এমন একটি জ্যোতি বের হলো, যা সিরিয়ার দূরবর্তী প্রাসাদগুলোকে আলোকিত করে তোলে।' ইমাম আহমাদ, দারেমি ও অন্যান্যরা এমনই কাছাকাছি একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।[১১৫]

নবুওয়াতের আলামত হিসেবে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। যেমন—পারস্য সম্রাট কিসরার প্রাসাদের ১৪টি গম্বুজ ধসে পড়ে। অগ্নিপূজকদের দীর্ঘদিন ধরে প্রজ্বলিত পূজার অগ্নি নিভে যায়। সাওয়া হ্রদের পানি শুকিয়ে যায় এবং তার আশপাশের গির্জাগুলোও ধসে পড়ে। নবুওয়াতের আলামত হিসেবে এই ঘটনাগুলো তাবারি, বাইহাকি ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন।[১১৬] তবে এগুলো ঐতিহাসিক ও হাদিস বিশ্লেষণের দিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্কিত। যেমন এর কোনো প্রমাণিত সনদ নেই এবং সেই সময়ের জাতির ইতিহাস থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। সেখানে এ ধরনের ঘটনার কোনো সাক্ষ্য নেই। যদিও এ সকল ঘটনা সে সময়ের জাতির ইতিহাসে সবার আগে স্থান

---

[১১২] সহিহ মুসলিম—খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা নং ১৩৯২; হাদিস নং ১৭৭১; তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার—পৃষ্ঠা নং ৪।

[১১৩] নাতাইজুল আফহাম ফি তাকবিমিল আরাবি কবলাল ইসলাম, জ্যোতির্বিদ মাহমুদ পাশা, পৃষ্ঠা নং ২৮-৩৫, বৈরুত সংস্করণ।

[১১৪] ২০ এপ্রিল পুরোনো খ্রিস্টীয় (গ্রেগরীয়) ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, আর ২২ এপ্রিল নতুন খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। রহমাতুল লিল আলামিন, খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৩৮-৩৯।

[১১৫] মুসনাদু আহমাদ: খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা নং ১২৭, ১২৮, ১৮৫; খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা নং ২৬২; সুনানুদ দারেমি: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯। তাবাকাতু ইবনি সাদ—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১০২।

[১১৬] দালাইলুন নুবুয়্যাহ, বাইহাকি : খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১২৬-১২৭; তারিখুত তাবারি : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ১৬৬-১৬৭; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিয়াহা : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৬৮-২৬৯।

পাওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল।[১১৭] বিদগ্ধ সিরাত গবেষক শাইখ মুহাম্মাদ গাজালিও এ বর্ণনাগুলো সমর্থন করেননি।[১১৮]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণের পরপরই তাকে তার দাদা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। নাতিকে দেখে আব্দুল মুত্তালিবের আনন্দের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়ে সরাসরি বাইতুল্লাহতে প্রবেশ করেন। সেখানে আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং নাতির জন্য বিশেষ দুআ করেন।[১১৯] আব্দুল মুত্তালিব নিজেই নবিজির নাম রাখেন 'মুহাম্মাদ', যা সেই সময় আরবে একেবারেই অপরিচিত ও বিরল নাম ছিল। আরব সমাজের রীতি অনুযায়ী, নবিজির জন্মের সপ্তম দিনে তার খতনা সম্পন্ন করা হয়।[১২০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের এক সপ্তাহ পর্যন্ত নিজের মায়ের দুধ পান করেন। এরপর তিনি তাঁর প্রথম দুধমাতা হিসেবে সুওয়াইবার দুধ পান করেন। সুওয়াইবা ছিলেন আবু লাহাবের দাসী। এ সময় সুওয়াইবার কোলেও একটি বাচ্চা ছিল, যার নাম ছিল মাসরুহ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, নবিজির চাচা হামজা ইবনু

---

[১১৭] মুখতাসারু সিরাতির রাসুল, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি, পৃষ্ঠা: ১২ শাইখ মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ মাল্লাহ বলেন, লেখক যে বলেছেন, 'এর কোনো প্রমাণিত সনদ নেই এবং সেই সময়ের জাতির ইতিহাসেও এ ধরনের ঘটনার কোনো সাক্ষ্য নেই। যদিও এ সকল ঘটনা সে সময়ের জাতির ইতিহাসে সবার আগে স্থান পাওয়াটাই অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল'—এই কথাটি সঠিক। যেমন ইমাম জাহাবি এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, এটি একটি মুনকার ও গারিব হাদিস। যেমনটি শাইখ জিয়া আল-উমারি তার আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাতুস সহিহা নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ১০০ নং পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

[১১৮] ফিকহুস সিরাহ, মুহাম্মাদ আল-গাজালি—পৃষ্ঠা নং ৪৬।

[১১৯] সিরাতু ইবনি হিশাম—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১৫৯-১৬০। তারিখুত তাবারি: খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ১৫৬-১৫৭; ইবনু সাদ: খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১০২।

[১২০] কথিত আছে, তিনি খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন, দেখুন, তালকিহু ফুতুমি আহলিল আসার, পৃষ্ঠা: ৪; নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগতভাবে খতনা অবস্থায় জন্মেছিলেন অথবা জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে খতনা করেছিলেন—এ কথা সহিহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। শাইখ আলবানি, ইবনুল কাইয়িম (জাদুল মাআদ : ১/১৮), ইবনুল আদিম ও আর রাহিকুল মাখতুম গ্রন্থের লেখক এ মত গ্রহণ করেছেন যে—নবিজির জন্মের সপ্তম দিনে দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর খতনা করিয়েছিলেন। [দেখুন আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম, শাইখ মাহমুদ আল-মাল্লাহ, পৃষ্ঠা নং ৩৩১]

আব্দিল মুত্তালিবও সুওয়াইবার দুধ পান করেছিলেন। একইভাবে, পরে আবু সালামা ইবনু আব্দিল আসাদ আল মাখজুমিও তার দুধ পান করেন।[১২১]

বনু সাদে

তখনকার শহুরে আরব সমাজে নবজাতক শিশুদের গ্রামীণ পরিবেশে দুধমাতার কাছে লালনপালন করানোর রীতি প্রচলিত ছিল। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ ছিল। প্রথমত, গ্রামাঞ্চলের নির্মল পরিবেশে শিশুরা শহরের নানা রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকত। দ্বিতীয়ত, গ্রামের বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শেখার মাধ্যমে শিশুরা ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করত। তৃতীয়ত, এই গ্রামীণ পরিবেশ শিশুর শারীরিক এবং মানসিক বিকাশের জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করত। এই উদ্দেশ্যে দাদা আব্দুল মুত্তালিব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য একজন দুধমাতা খুঁজতে থাকেন এবং বনু সাদ ইবনু বকর গোত্রের হালিমা বিনতু আবি জুয়াইবকে পান।

হালিমার স্বামী ছিলেন হারিস ইবনু আব্দিল উজ্জা, যার উপনাম আবু কাবশা। নবিজি হালিমার ঘরে থেকে তার দুধ ভাই-বোনদের সঙ্গে বড় হন। তার দুধ ভাই-বোনেরা হলেন: আবদুল্লাহ ইবনু হারিস, উনাইসা বিনতু হারিস এবং হুজাফা বা জুজামা বিনতু হারিস। জুজামার উপাধি শাইমা। সে এই নামেই বেশি পরিচিত ছিল। শাইমা নবিজিকে ছোটবেলায় কোলে কোলে রাখতেন এবং স্নেহ করতেন।

নবিজির চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনু হারিস ইবনি আব্দিল মুত্তালিবও তার দুধভাই ছিলেন। এমনকি নবিজির চাচা হামজা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবকেও দুধ পানের জন্য বনু সাদ গোত্রের এক মহিলার কাছে পাঠানো হয়। নবিজি তাঁর দুধমাতা হালিমার কাছে থাকাকালে একদিন সেই মহিলা তাকে দুধ পান করান। এভাবে নবিজি এবং হামজা রাদিয়াল্লাহু আনহু দুই দিক থেকেই দুধভাই হন—একটি সুওয়াইবার দিক থেকে এবং অন্যটি বনু সাদের দিক থেকে।[১২২]

---

[১২১] সহিহ বুখারি : ২৬৪৫, ৫১০০, ৫১০১, ৫১০৬, ৫১০৭, ৫৩৭২। তারিখুত তাবারি : খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ১৫৮। তবে তাঁর সনদ নিয়ে আপত্তি আছে। আবু নাঈম প্রণীত দালায়েলুন নবুওয়্যাহ : খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা নং ১৫৭।

[১২২] জাদুল মাআদ—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১৯, নবিজিকে দুধপান করানোর উদ্দেশ্যে হালিমা সাদিয়ার তাঁকে গ্রহণ করা এবং পথমধ্যে বরকত প্রত্যক্ষ করা—এই পুরো ঘটনা প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ হলেও সনদের দিক থেকে দুর্বল। ইমাম জাহাবি, ইবনু কাসির, ইবনু হিব্বান, ইবনু হাজার এবং দাবিশ এটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। অপরদিকে ইবনু আসাকির, আলবানি, আকরাম জিয়া আল-উমারি এটিকে দুর্বল বলেছেন। তবে যেহেতু এই বর্ণনা কোনো শরিয়তের বিধান বা হুকুমের উপর নির্ভর

হালিমা বিনতু আবি জুয়াইব নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। চলুন তার কাছেই শুনি এর বিস্তারিত বিবরণ।

ইবনু ইসহাকের বর্ণনামতে হালিমা বলেন, আমি আমার স্বামীর সাথে আমাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ বনু সাদ গোত্রের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে নিজেদের শহর ছেড়ে বের হলাম। সেটা ছিল দুর্ভিক্ষের বছর; চারিদিকে অভাব অনটন। আমার একটি গাধি ছিল। সেটি নিয়ে বের হই। আমি একটি গাধির পিঠে সওয়ার ছিলাম। আমাদের কাছে একটি উটনিও ছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম, সেই উটনি একফোঁটাও দুধ দিত না।

ক্ষুধার জ্বালায় দুধের শিশুরা ছটফট করত। রাতে ঘুমাতে পারতাম না। আমার বুকেও দুধ ছিল না, উটনিও দুধ দিত না। তবু বৃষ্টি নামবে এবং স্বস্তি ফিরে আসবে, এই আশায় আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম। গাধির পিঠে সওয়ার হয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর শীর্ণতা ও দুর্বলতার কারণে গাধি এত ধীরে চলতে লাগল যে, কাফেলার সবাই বিরক্ত হয়ে গেল। একপর্যায়ে আমরা দুধের শিশুর সন্ধানে মক্কায় এসে পৌঁছলাম।

আমাদের কাফেলার যত মহিলা ছিল, সকলের কাছেই আল্লাহর রাসুলকে পেশ করা হলো। কিন্তু তার বাবা নেই, এতিম, এটা শুনে সবাই তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। কেননা আমরা সবাই সন্তানের পরিবার থেকে ভালো পারিশ্রমিকের আশা রাখতাম। তাই সবাই বলত, ছেলেটা এতিম, তার মা আর দাদা মিলে কীই-বা দেবে! এ কারণেই আমরা কেউ তাকে নিতে রাজি হইনি। এদিকে আমাদের কাফেলার প্রত্যেক মহিলাই কোনো-না-কোনো শিশু পেয়ে গেল। আমি কোনো শিশুই পেলাম না। ফেরার সময় স্বামীকে বললাম, আল্লাহর শপথ, খালি হাতে ফিরে যেতে আমার খুব খারাপ লাগছে। আমি বরং সেই এতিম শিশুকেই নিয়ে যাই। স্বামী রাজি হলেন। বললেন, হয়তো ওর উসিলায় আল্লাহ তাআলা আমাদের বরকত দেবেন। এরপর আমি গিয়ে তাঁবুতে তাকে গ্রহণ করলাম।

করে না, এতে কোনো শরয়ি বিধান বা হুকুম জড়িত নয়, তাই এর বর্ণনায় সাধারণত ছাড় দেওয়া হয় এবং উল্লেখ করাও বৈধ।

বিশেষ করে,নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 'বনু সাদ ইবনু বকর' গোত্রে দুধ পান করেছেন, তা তো শক্তিশালি ও সহিহ সনদ দ্বারা প্রমাণিত। যেমনটি হাফেজ ইবনু কাসির তাঁর বিখ্যাত আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া গ্রন্থে (২/২৭৫), বাইহাকি দালাইলুন নুবুয়্যাতে (১/১৪৬), তাবারি তার তারিখে (১/১২৮) উল্লেখ করেছেন। [দেখুন আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম, শাইখ মাহমুদ আল-মাল্লাহ, পৃষ্ঠা নং ৯৬ এবং ৩৩২]

হালিমা বলেন, তারপর আমি গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিই। সত্যি বলতে কী, অন্য কোনো শিশু না পেয়েই আমি তাকে নিয়েছিলাম সেদিন।

তারপর বলেন, তাকে নিয়ে আমি যখন ডেরায় ফিরে এলাম তখন আমার উভয় স্তন ছিল দুধে পূর্ণ, শিশু মুহাম্মাদ পেট ভরে দুধ পান করল। তার সঙ্গে তার দুধ ভাইও পেট ভরে দুধ পান করল। এরপর উভয়ে স্বস্তির সাথে ঘুমিয়ে পড়ল। অথচ এর আগে আমার সন্তান ক্ষুধার জ্বালায় ঘুমাতে পারত না। এদিকে আমার স্বামী উটনি দোহন করতে গিয়ে লক্ষ করল তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ। তিনি এত দুধ দোহন করলেন যে, আমরা তৃপ্তির সাথে পান করলাম। বড় আরামে আমরা রাত কাটালাম। সকালে আমার স্বামী বললেন, খোদার কসম, জেনে রেখো হালিমা, তুমি একটি বরকতময় শিশু গ্রহণ করেছে। আমি বললাম, আমারও তাই মনে হয়। হালিমা বলেন, এরপর আমাদের কাফেলা রওয়ানা হলো। আমি দুর্বল গাধার পিঠে সওয়ার হলাম। সঙ্গে নেই মুহাম্মাদকে। আল্লাহর কসম, গাধা এত দ্রুত পথচলা শুরু করল যে, সব গাধাকে ছাড়িয়ে গেল। সঙ্গিনী মহিলারা অবাক হয়ে বলল, ও আবু জুয়াইবের কন্যা, এটা কী আশ্চর্য ব্যাপার, আমাদের দিকে একটু তাকাও। যে গাধায় সওয়ার হয়ে তুমি এসেছিলে, এটা কি সেই গাধাটিই না? আমি বললাম, হ্যাঁ, সেটিই। তখন তারা বলল, এর মধ্যে নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো ব্যাপার রয়েছে। এরপর আমরা বনু সাদ অঞ্চলে নিজেদের ঘরে ফিরে এলাম। সে সময় আমাদের এলাকার চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষকবলিত অন্য কোনো এলাকা ছিল কি না আমার জানা ছিল না। তবু আমাদের বকরিগুলো চারণভূমিতে গেলে ভরা পেট ও ভরা স্তনে ফিরে আসত। আমরা দুধ দোহন করে পান করতাম। অথচ সে সময় অন্য কেউ দুধই পেত না। তাদের পশুদের স্তনে কোনো দুধই থাকত না। আমাদের কওমের লোকেরা রাখালদের বলত, হতভাগ্যের দল হালিমার রাখাল যেখানে বকরি চরায়, তোমরা সেখানে চরাতে পারো না! কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না। তাদের বকরিগুলো খালি পেটেই ফিরে আসত। একটুও দুধ তাদের স্তনে পাওয়া যেত না। অথচ আমার বকরিগুলো ভরাপেটে এবং ভরা স্তনে ফিরে আসত। এমনি করে আমরা আল্লাহর রহমত ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম। শিশুর বয়স দুই বছর হওয়ার পর আমরা তাকে দুধ ছাড়ালাম। অন্যান্য শিশুদের চেয়ে এই শিশু ছিল অধিক হৃষ্টপুষ্ট এবং স্বাস্থ্যবান। এরপর আমরা শিশুটিকে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। আমরা তার কারণে বরকত প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তাই চাচ্ছিলাম যে, শিশুটি আমাদের কাছেই আরও কিছুদিন থাকুক। তাই এ ব্যাপারে আমরা তার মায়ের সঙ্গে কথা বললাম। তাকে বললাম, ছেলেটা আরেকটু বড় হওয়া পর্যন্ত যদি আমাদের কাছে রাখতেন!

কারণ আমি তার ব্যাপারে মক্কার রোগব্যাধির ভয় করছি। তিনি বলেন, বারবার আবেদন নিবেদন জানাতে একসময় বিবি আমিনা রাজি হয়ে গেলেন।[১২৩]

বক্ষ বিদারণ

এভাবেই শিশু মুহাম্মাদ বনু সাদে ফিরে আসেন। ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী ফিরে আসার কয়েক মাস পরে,[১২৪] মুহাক্কিকিনদের মতানুসারে চার বছর বয়সে তাঁর বক্ষবিদারণের ঘটনা ঘটে।[১২৫] সেদিন নবিজি কিছু বাচ্চার সাথে খেলছিলেন, হঠাৎ করে জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে আসেন। তিনি নবিজিকে তুলে নিয়ে মাটিতে শুইয়ে দেন এবং তাঁর বুক চিরে হৃৎপিণ্ডটি বের করে আনেন। তারপর বক্ষ থেকে একটি রক্তপিণ্ড বের করে তিনি বলেন, 'এটা হলো আপনার মাঝে শয়তানের অংশ।' এরপর তিনি হৃৎপিণ্ডটি একটি স্বর্ণের পাত্রে রাখেন, জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে সেটিকে যথাস্থানে স্থাপন করে আগের মতো শরীর মিলিয়ে দেন।

এই সময় নবিজির সাথে খেলতে থাকা শিশুরা দৌড়ে গিয়ে তার দুধমায়ের কাছে গিয়ে বলে, 'মুহাম্মাদকে তো হত্যা করা হয়েছে!' এ কথা শুনে সবাই সেখানে ছুটে আসে এবং দেখে ভয়ে তার চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে গেছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুকে সে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।[১২৬]

ফিরে এলেন মমতাময়ী মায়ের কোলে

বক্ষবিদারণের ঘটনার পর দুধমাতা হালিমা বেশ ভীত হয়ে পড়েন। দ্রুত তিনি শিশু মুহাম্মাদকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিয়ে আসেন। এরপর ৬ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি তার মায়ের কাছেই থাকেন।

---

[১২৩] সিরাতু ইবনি হিশাম—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১৬২-১৬৪, তারিখুত তাবারি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ১৫৮, ১৫৯, সহিহ ইবনু হিব্বান—খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা নং ৮২-৮৪, তাবাকাতু ইবনি সাদ—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১১১, এরা সবাই ইবনু ইসহাকের সূত্রে শব্দগত সামান্য পরিবর্তনের সাথে বর্ণনা করেছেন।

[১২৪] সিরাতু ইবনি হিশাম—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১৬৪-১৬৫, তারিখে তাবারি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ১৬০।

[১২৫] তাবাকাতু ইবনু সাদ—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১১২, মুরুজুয জাহাব, মাসউদি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৮১, আবু নুআইম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে এটাকে নবিজির জন্মের পঞ্চম বছরের ঘটনা বলেছেন। [দেখুন দালাইলুন নাবুয়্যাহ—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১৬১, ১৬২] তবে ইবনু ইসহাকের বক্তব্যে কিছুটা বিরোধপূর্ণ মনে হয়। কারণ মাত্র দুই বছর বয়সি একটি শিশুর পক্ষে পশুচারণ অসম্ভব এবং তখন সে মাত্র তৃতীয় বছরে প্রবেশ করছে।

[১২৬] সহিহ মুসলিম, নবিজির মিরাজ অধ্যায়—হাদিস নং ৩০২।

এদিকে মা আমিনা নিয়ত করেন যে, তিনি ইয়াসরিবে তার মরহুম স্বামীর কবর জিয়ারত করবেন। তিনি মক্কা থেকে বের হন। সঙ্গে ছিল শিশু মুহাম্মাদ, দাসী উম্মু আইমান এবং শ্বশুর আব্দুল মুত্তালিব। তারপর ৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সেখানে পৌঁছান। সেখানে ১ মাস অবস্থান করে মক্কার ফেরার জন্য রওয়ানা হন। কিন্তু পথমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মক্কা-মদিনার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে তার মৃত্যু হয়।[১২৭]

দাদার সান্নিধ্যে

বৃদ্ধ আব্দুল মুত্তালিব নবিজিকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং এ সময় নবিজি একের পর এক শোকের সম্মুখীন হন। প্রথমে তিনি পিতাকে হারিয়েছিলেন, এবার মাকে হারান। এ যেন পুরোনো কষ্টের আগুনে নতুন এক যন্ত্রণার হাওয়া। এতিম নবিজির জীবন ক্রমাগত কঠিন হয়ে উঠছিল, তবে দাদার হৃদয়ে মমতার এক প্রবাহ যেন নবিজিকে নতুন করে আশ্রয় দেয়। ছেলেদের চেয়ে নাতিকে তিনি বেশি ভালোবেসে ফেলেন এবং তাকে বিশেষভাবে স্নেহ করেন। নিঃসঙ্গ বলে তাকে অবহেলা না করে নিজের ছেলেদের ওপর প্রাধান্য দেন।

ইবনু হিশাম লিখেছেন, আব্দুল মুত্তালিবের জন্য বাইতুল্লাহর ছায়ায় একটি বিশেষ বিছানা বিছানো হতো। তার সব সন্তান সেই বিছানার চারপাশে বসত। তার সম্মানার্থে কেউ ওপরে উঠত না; কিন্তু নবিজি, ছোট শিশু হয়েও সেই বিছানায় উঠে বসতেন। তখন চাচারা তাকে বিছানা থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। আব্দুল মুত্তালিব দেখলে বলতেন, 'তোমরা আমার এ নাতিকে সরিয়ে দিয়ো না। আল্লাহর কসম, সে বড় কিছু হবে।' এরপর তিনি নাতিকে নিজের পাশে বসাতেন এবং তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতেন। শিশু মুহাম্মাদের কর্মকাণ্ড দেখে তিনি বেশ আনন্দ পেতেন।[১২৮]

---

[১২৭] সিরাতু ইবনি হিশাম—খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা নং ১৬৮; তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার—পৃষ্ঠা নং ৭, **তাহকিক:** শাক্কুস-সদর (বক্ষ বিদারণ) ঘটনার পর হালিমার ভয় পেয়ে যাওয়া এবং নবিজিকে ফেরত দেওয়া। এমনিভাবে স্বামীর কবর জিয়ারত করে মদিনা থেকে ফেরার পথে মা আমিনার ইন্তিকাল করা—ড. আকরাম জিয়া আল-উমারি তার বিখ্যাত আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাতুস সহিহা গ্রন্থে (১/১০৫) বলেন, এগুলো ঐতিহাসিক রেওয়ায়েত হিসেবে স্বীকৃত হলেও হাদিসের মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যেহেতু এতে কোনো আহকাম বা শরয়ি বিধান নেই, তাই অনেক ইতিহাসবিদ এগুলোর উল্লেখে ছাড় দিয়েছেন। [দেখুন আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম, শাই মাহমুদ আল-মাল্লাহ, পৃষ্ঠা নং ৯৬-৯৭ এবং ৩৩২]

[১২৮] সিরাতু ইবনি হিশাম—খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা নং ১৬৮; এর বর্ণনাটির সনদ মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন) [দেখুন আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম, শাইখ মাহমুদ আল-মাল্লাহ, পৃষ্ঠা নং ৯৮ এবং ৩৩২]

নবিজির বয়স যখন ৮ বছর ২ মাস ১০ দিন, তখন দাদা আব্দুল মুত্তালিব মক্কায় মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে আব্দুল মুত্তালিব মুহাম্মাদের লালনপালনের দায়িত্ব আবু তালেবকে দিয়ে যান। আবু তালিব ছিলেন নবিজির আপন চাচা।[১২৯]

প্রিয় চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে

আবু তালিব তার ভাতিজার জিম্মাদারি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সঙ্গে পালন করেছেন। নিজের সন্তানের মতো নবিজিকে বুকে টেনে নিয়েছেন। বরং নিজের সন্তানদের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন তাকে। কখনো তাকে কটু কথা শোনাননি। তার ওপর কখনো রাগান্বিত হননি। নবিজির বয়স যখন ৮ বছর, তখন থেকে শুরু করে দীর্ঘ ৪০ বছর তিনি তার সান্নিধ্যে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে চাচা তাকে সব সময় বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। যখন পুরো কুরাইশ গোত্র নবিজির বিরুদ্ধে ছিল, তখনো তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেসব আলোচনা যথাস্থানে আসবে, ইনশাআল্লাহ।

তার উসিলায় বৃষ্টি কামনা

ইবনু আসাকি জালহুমা ইবনু উরফুতার সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি একবার মক্কায় গেলাম। সেখানে তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। কুরাইশরা তখন বলে, আবু তালিব! উপত্যকায় খরা দেখা দিয়েছে, পরিবার পরিজন না খেয়ে আছে, চলুন বৃষ্টির জন্য দুআ করি! এ কথা শুনে আবু তালিব এক বালককে সঙ্গে নিয়ে বের হন। বালকটিকে দেখে মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো মনে হচ্ছিল। থেকে থেকে যেন দ্যুতি ছড়াচ্ছিল তার চেহারা থেকে। আশেপাশে অন্যান্য বালকও ছিল। আবু তালিব বালকটিকে সঙ্গে করে কাবাঘরের সামনে গেলেন। তারপর তাকে কাবার দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসালেন। বালকটি তার আঙুল ধরে রেখেছিল। আকাশে তখন এক টুকরো মেঘও ছিল না। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সমগ্র আকাশ মেঘে ছেয়ে মুষলধারে বৃষ্টির ধারা নামতে শুরু করে। নিম্নভূমিতে পানি জমে ওঠে, উপত্যকাগুলো উপচে পড়ে। চারদিক সবুজ হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে এদিকে ইঙ্গিত করে আবু তালিব

---

[১২৯] সিরাতু ইবনি হিশাম—খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা নং ১৬৮; তালকিহু ফুহুমি আহলিল আসার—পৃষ্ঠা নং ৭, **তাহকিক:** মাহমুদ আল-মাল্লাহ বলেন, এর সনদ জয়িফ। ইবনু ইসহাক এটি মুনকাতি সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাহাবির সিরাতেও অত্যন্ত জয়িফ সনদে এসেছে। তাবাকাতে ওয়াকিদির সনদে এসেছে। আর ওয়াকেদি একজন মাতরুক (পরিত্যাজ্য রাবি)। [দেখুন আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম, পৃষ্ঠা নং ৯৯ এবং ৩৩২]

বলেছিলেন—তিনি শুভ্র সফেদ সুদর্শন। তার চেহারার উসিলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। তিনি এতিমদের আশ্রয় এবং বিধবাদের সুরক্ষা দানকারী।[১৩০]

পাদরি বাহিরা[১৩১]

এরপর যখন নবিজির বয়স ১২ বছর, অথবা ১২ বছর ২ মাস ১০ দিন,[১৩২] তখন তিনি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়ার বাণিজ্যিক সফরে বের হন। বুসরা—بُصْرَى—শহরে তাদের যাত্রাবিরতি হয়। বুসরা তখন সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং হাওরান রাজ্যের রাজধানী ছিল। এটি ছিল রোমানদের শাসিত এবং আরবাঞ্চলের এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। বুসরায় এক পাদরি ছিলেন, যার নাম ছিল জারজিস, তবে তিনি বাহিরা নামে বেশি পরিচিত। আবু তালিবের কাফেলা বুসরায় তাঁবু স্থাপনের পর বাহিরা গির্জা থেকে বের হয়ে তাদের কাছে যান এবং তাদের মেহমানদারি করেন। অথচ আগে কখনো তাকে এমনটি করতে দেখা যায়নি। তিনি কখনো গির্জা থেকে বের হতেন না। তিনি নবিজিকে দেখে চিনে ফেললেন এবং তার হাত ধরে বলেন, 'ইনি সাইয়েদুল আলামিন (বিশ্বজগতের নেতা), ইনি রাসুলু রব্বিল আলামিন (বিশ্বজগতের প্রতিপালকের রাসুল) এবং আল্লাহ তাআলা তাকে রহমাতুল্লিল আলামিন করে (সমগ্র জগদ্‌বাসীর জন্য রহমতস্বরূপ) প্রেরণ করবেন।' তখন আবু তালিব ও কুরাইশের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা জানতে চান, তার এই দাবির প্রমাণ কী? তখন তিনি বলেন, 'আপনারা যখন এ উপত্যকা হতে নামছিলেন, তখন (আমি লক্ষ করেছি) পথে যত পাথর ও গাছ ছিল, সবই মুহাম্মাদকে সিজদা করেছিল। নবি ছাড়া অন্য কারও প্রতি এরা সিজদাবনত হয় না। তা ছাড়া তার কাঁধের নিচে আপেলের মতো মোহরে নবুওয়াতের সাহায্যে আমি তাকে চিনেছি,[১৩৩] যার আলোচনা আমরা আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে দেখেছি।'

---

[১৩০] মুখতাসারু সিরাতির রাসুল, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব আন-নাজদি—পৃষ্ঠা নং ১৫-১৬। হাইসামি তাবারানির সূত্রে এমন একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। দেখুন, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ, আলামাতুন নাবুয়্যাহ অধ্যায়—খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা নং ২২২।

[১৩১] বুহাইরা না; বাহিরা بَحِيْرَى

[১৩২] তালকিহু ফুতুমি আহলিল আসার—পৃষ্ঠা নং ৭।

এ ছাড়া, বাহিরা ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের কথা চিন্তা করে নবিজিকে সিরিয়ায় যেতে নিষেধ করেন। তিনি পরামর্শ দেন, যাতে নবিজিকে মক্কায় ফিরিয়ে আনা হয়। আবু তালিব সেই পরামর্শ মেনে নবিজিকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।[১৩৪]

ফিজারের যুদ্ধ

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন ২০ বছর, তখন উকাজ বাজারে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের এক পক্ষে ছিলেন কুরাইশ ও তাদের মিত্র—কিনানা এবং অপর পক্ষে ছিলেন কায়স আইলান। ইতিহাসের পাতায় যা ফিজার যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত।[১৩৫] এ যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, বনু কিনানার জনৈক বাররাজ নামে এক ব্যক্তি কায়স আইলানের তিন লোককে হত্যা করে। এ

---

[১৩৪] দেখুন জামিউত তিরমিজি—৩৬২০। তারিখে তাবারি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৭৮,২৭৯, মুসান্নাফে ইবনি আবি শাইবা—খণ্ড ১১, পৃষ্ঠা নং ৪৮৯, হাদিস নং ১১৭৮২। দালাইলুন নাবুয়্যাহ, বাইহাকি—খণ্ড ২, পৃষ্ঠা নং ২৪, ২৫। দালাইলুন নাবুয়্যাহ, আবু নুআইম—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১৭০। এর সনদ সহিহ এবং শক্তিশালী। তবে এই বর্ণনার শেষে একটা কথা আছে, 'আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলের সঙ্গে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে পাঠিয়েছিলেন।' অর্থাৎ নবিজি বিলালের সাথে মক্কায় ফিরে যান। এটা সুস্পষ্ট একটা ভুল কথা। বর্ণনার এই অংশটুকু মুনকার বলে কথিত। কেননা এটা পরিষ্কার যে, সেসময় বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্মই হয়নি। আর জন্ম হয়ে থাকলেও তিনি আবু তালেব বা আবু বকরের সাথে পরিচিত ছিলেন না—জাদুল মাআদ খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ১৭।
এই ঘটনার আরও বিশদ কিছু বিবরণ বর্ণনা করা হয়েছে:

- ইবনু সাদ তাবাকাতে (১/১২০) এই ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।
- ইবনু ইসহাক সনদ ছাড়াই এই ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ইবনু হিশাম আবার তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন (সিরাতে ইবনু হিশাম ১/১৮০-১৮৩)।
- তাবারি (১/১২০), বাইহাকি এবং আবু নুআইমও এটি বর্ণনা করেছেন।

[১৩৫] '(الفجارات)' (ফিজারাত)—এখানে 'ফা' (ف) হরফটি কাসরাহ সহ উচ্চারিত। কুরাইশ ও তাদের মিত্র কিনানা এবং কায়স—এই দুই পক্ষের মধ্যে চারটি ফিজার যুদ্ধ হয়েছিল। প্রথম তিনটি আপসের মাধ্যমে সমাধান হয়েছিল। কোনো যুদ্ধের রূপ নেয়নি। প্রথমটির কারণ ছিল আর্থিক। অর্থাৎ একটি ঋণ পরিশোধে বিলম্ব, যা কিনানা গোত্রের ওপর কায়স গোত্রের দাবি ছিল। দ্বিতীয়টি উকাজ (عكاظ) বাজারে কিনানা গোষ্ঠীর দম্ভ ও অহংকার প্রদর্শনকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল। তৃতীয়টি মক্কার কয়েকজন যুবক কায়সের এক সুন্দরী মহিলার সম্ভ্রমহানি করাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল।

চতুর্থটি সবচেয়ে গুরুতর ছিল। এই যুদ্ধটি 'ফিজারুল বাররদ' নামে পরিচিত, যা আমরা বইতে উল্লেখ করেছি। বিস্তারিত জানতে দেখুন মুহাম্মাদ ইবনু হাবিব আল-বাগদাদি কৃত আল-মুনাম্মাক ফি আখবারি কুরাইশ—পৃষ্ঠা নং ১৬০-১৬৪ এবং আল-কামিল, ইবনুল আসির—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ৪৬৭। ইবনুল আসির প্রথম তিনটি ফিজারকে একটি ফিজার হিসেবে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

সংবাদ উকাজ বাজারে পৌঁছলে উভয় দলের মাঝে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং একপর্যায়ে যুদ্ধ বেধে যায়। কুরাইশ ও কিনানা মিত্রপক্ষের সেনাপতি ছিলেন হারব ইবনু উমাইয়া। কারণ বয়স ও মর্যাদার কারণে কুরাইশের কাছে সে সম্মানের পাত্র ছিল। যুদ্ধে দিনের প্রথম ভাগে কাইস গোত্রের অবস্থান ভালো থাকলেও মধ্যভাগে কিনানা গোত্র এগিয়ে যায়। অতঃপর কুরাইশের কতক ব্যক্তি উভয় পক্ষের নিহতদের বিষয়ে সমঝোতার লক্ষ্যে এভাবে সন্ধির প্রস্তাব দেন যে, নিহতদের সংখ্যা গণনা করা হবে। তারপর কোনো পক্ষে বেশি নিহত থাকলে অতিরিক্ত নিহতের দিয়ত গ্রহণ করা হবে। তখন উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে সন্ধি করে নেয় এবং যুদ্ধ বন্ধ করে নিজেদের মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষের কথা ভুলে যায়। হারাম মাসের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করে এ যুদ্ধ ঘটে বিধায় এর নাম দেওয়া হয় 'হারবুল ফিজার' তথা পাপীদের যুদ্ধ। নবিজিও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন (তার চাচাগণ তাকে সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, তবে তিনি যুদ্ধ করেননি)। তিনি শুধু তার চাচাদের দিকে শত্রুদের ছুড়ে মারা তির ও বর্শা কুড়িয়ে এনে তাদের হাতে দিতেন।[১৩৬]

হিলফুল ফুজুল

ফিজার যুদ্ধের পরপরই পবিত্র জিলকদ মাসে হিলফুল ফুজুল (শান্তি ও ন্যায়সংঘ) চুক্তিটি সংঘটিত হয়। এ মাসটিও যুদ্ধনিষিদ্ধ বিশেষ চারটি মাসের একটি। এ লক্ষ্যে কুরাইশের বিভিন্ন শাখাগোত্র—বনু হাশিম, বনু মুত্তালিব, আসাদ ইবনু আব্দিল উজ্জা, জুহরা ইবনু কিলাব এবং তাইম ইবনু মুররা এ চুক্তিটি সংঘটিত করার আহ্বান করে। তারা আবদুল্লাহ ইবনু জুদআন তাইমির বাড়িতে একত্রিত হয়। তিনি ছিলেন তৎকালীন মক্কার একজন অত্যন্ত সম্মানিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। সেখানে তারা সবাই এই মর্মে শপথ করলেন যে, মক্কায় যেই জুলুমের শিকার হবে, চাই সে মক্কার অধিবাসী হোক কিংবা বাইরের কেউ, সকলে মিলে তার পাশে দাঁড়াবে। আর

---

[১৩৬] সিরাতু ইবনি হিশাম—খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা নং ১৮৪-১৮৭; আল-মুনাম্মাক ফি আখবারি কুরাইশ—পৃষ্ঠা নং ১৬৪-১৮৫; আল-কামিল, ইবনুল আছির—খণ্ড ১, পৃষ্ঠা নং ৪৬৮-৪৭২; কলবু জাজিরাতিল আরব—পৃষ্ঠা নং ২৬০; মুহাদরাতু তারিখিল উমামিল ইসলামিয়া, খুদারি—খণ্ড: ১, পৃষ্ঠা নং ৬৩।

তাহকিক: এর সবগুলো সনদই জয়িফ। ইবনু ইসহাক এটি সনদ ছাড়া বর্ণনা করেছেন। ইমাম জাহাবি তারিখুল ইসলামে ও ইবনু কাসির আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-গ্রন্থে তার থেকে বর্ণনা করেছেন। ডক্টর আকরাম জিয়া আল-উমারি তার বিখ্যাত আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাতুস সহিহা গ্রন্থে (১/১১১) বলেন, এ যুদ্ধে নবিজির অংশগ্রহণের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। [বিস্তারিত আরও তাহকিক দেখুন আত-তালিক আলার রাহিকিল মাখতুম, শাই মাহমুদ আল-মাল্লাহ, পৃষ্ঠা নং ৯৯-১০০]